১৩ মার্চ ২০২৬ রাজ্যের কর্মচারীদের এক ঐতিহাসিক প্রতিরোধের ধর্মঘট প্রত্যক্ষ করলো রাজ্যের মানুষ

‘কালীঘাট চলো’ অভিযান আটকালো পুলিশ

প্রতিবাদে ধর্মতলা অবরুদ্ধ

সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী বকেয়া মহার্ঘ ভাতা অবিলম্বে প্রদান এবং সকল স্তরের অনিয়মিত শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও কর্মচারীদের অবিলম্বে নিয়মিত করার দাবিতে গত ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ ‘কালীঘাট চলো’ অভিযানের ডাক দিয়েছিল রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের যৌথ মঞ্চ ও সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। বেলা সাড়ে বারোটায় ধর্মতলার লেনিন মূর্তির সামনে জমায়েত হয়ে দুপুর একটায় কালীঘাটের উদ্দেশ্যে মহামিছিল শুরু হওয়ার কথা ছিল। এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন সংগঠন থেকে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা বেলা বারোটার আগে থেকেই ধর্মতলা চত্বরে এসে জমা হতে থাকেন। সাড়ে বারোটার আগেই গোটা এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। কিন্তু মিছিল শুরু হওয়ার সাথে সাথেই পার্ক স্ট্রীট উড়ালপুলের আগে ব্যারিকেড করে গায়ের জোরে এই অভিযান আটকে দেয় পুলিশ প্রশাসন। ক্ষোভে ফুঁসতে থাকেন বিক্ষোভকারীরা। কিন্তু

কোনোরকম প্ররোচনায় পা না দিয়ে এর প্রতিবাদে পুরো ধর্মতলা চত্বর অবরুদ্ধ করে দেন তাঁরা। প্রতিবাদী জনতা রাস্তায় বসে এবং দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। মধ্য কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ডোরিনা ক্রসিং ও কে সি দাশের মোড়ে যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়। এর প্রভাব পড়ে গোটা শহরে এবং মধ্য কলকাতার সর্বত্র তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। দলদাস পুলিশ প্রশাসনের বারংবার আবেদনে কোনো কাজ হয় না। বিকেল চারটে পর্যন্ত এই অবরোধ চলে। অবরোধ উঠে যাওয়ার পর সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় যে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা অবিলম্বে প্রদান ও অন্যান্য দাবিতে রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সমস্ত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অফিসে আগামী ১৩ মার্চ ধর্মঘট হবে।

এদিনের মহামিছিল পুলিশ প্রশাসন ব্যারিকেড করে আটকে দেওয়ার বিরুদ্ধে রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো ২৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দ্রুত প্রদান এবং সরকারী দপ্তরে অস্থায়ীদের স্থায়ীকরণের মতো ন্যায্য দাবিতে আমরা মিছিল করে কালিঘাট যাওয়ার কর্মসূচী নিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের মিছিল করতে দেওয়া হলো না। রাজ্য সরকারের এই স্বৈরাচারী মনোভাবের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে এবং আগামী ১৩ মার্চ আমরা ধর্মঘট করে প্রশাসনকে স্তব্ধ করে দেব। □

ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী

একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের বার্তা

ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই প্রতিরোধের একমাত্র পথ

সংগ্রাম-আন্দোলন আর ঐতিহ্যের বহমান ধারায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের উত্তাপকে ধারণ করে নতুন উদ্যমে সংগ্রামে যুক্ত হওয়ার শপথ নিয়েছি। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে সমাজ উত্তরণের কালপর্বে আন্দোলন-সংগ্রামে কর্মচারী সমাজের ভূমিকা বারে বারে প্রমাণিত। যদিও সরকারী প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে ওঠার শুরু থেকে দেশী-বিদেশী উভয় শাসকের অধীনে কর্মরত কর্মচারী হিসেবে রাজকর্মচারীদের বিভিন্ন সময় ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়বিধ ভূমিকা সকলেরই জানা। দেশী-বিদেশী শাসক বা রাজ অনুগ্রহের সুবিধা ভোগ, আবার বিপরীত মেরুতে অবস্থান গ্রহণের জন্য রাজরোষের মুখোমুখি হয়েছে কর্মচারী সমাজ। যতদিন রাজন্যবর্গ বা প্রশাসকের স্বার্থরক্ষা হয়েছে ততদিন রাজকর্মচারীকে ব্যবহার করা হয়েছে। যখন স্বার্থ ফুরিয়েছে বা স্বার্থের বিঘ্ন ঘটেছে কর্মচারীকে আক্রমণ করা হয়েছে—এমন বহু ঘটনাবলী ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান প্রজন্মের কর্মচারীদের জীবনেও এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি এখনও ঘটে চলেছে। এই বিভ্রান্তিকর উপাদানের সম্মুখীন হয়ে কিছু অংশের কর্মচারী নিজের অবস্থান স্থির করতে দ্বিধাগ্রস্ত। উল্টোদিকে আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে অধিকাংশ শ্রমিক-কর্মচারীরা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম জারি রেখেছেন।

দেশের শ্রমজীবী আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমাজ। সমাজ দর্শনের অমোঘ সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করানোর চেতনায় তাদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা চলেছে। সংগঠনের প্রতিটি কাঠামো পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনে। ১০-১২ জানুয়ারী, ২০২৬ তিনদিন রাজ্য সম্মেলনে এক অনন্য অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে গেছেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কৃষ্ণনগর শহরে রাজ্য সম্মেলনে উপস্থিত থাকা সাত শতাধিক প্রতিনিধি। ১০ জানুয়ারী, ২০২৬ সকাল থেকে সম্মেলনের মূল কর্মকাণ্ড শুরু হলেও তার আগের দিন ৯ জানুয়ারী কৃষ্ণনগর শহরের গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণকে যুক্ত করে সংগঠিত হয়েছে বর্ণাঢ্য মিছিল। কারণ আমাদের সংগঠনের কাছে সম্মেলন সংগ্রামের মঞ্চ। আর আমাদের

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

সাধারণ সম্পাদক

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

‘মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার তখনি সে
পথকুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।’

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অপরাপর অংশের খেটে খাওয়া মানুষের থেকে ‘বিচ্ছিন্ন নয়’, ‘একাত্মতা’ হল এই সংগ্রামের মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু কোনো স্বয়ংক্রিয় শক্তি এই একাত্মতাকে গড়ে তুলতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় প্রতিদিন চাক্ষুষ করা অপরাপর অংশের মেহনতী মানুষের জীবন যন্ত্রণা, সামাজিক টানাপোড়েন ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিকে উপলব্ধি করা ও আত্মস্থ করা। এই প্রক্রিয়ায় যে আত্মপ্রত্যয়ের ভিত নির্মিত হয়, তাতে আবেগের প্রলেপ দেয় ইতিহাসে স্থান পাওয়া সংগঠনের ঘটনাবলী এবং ইতিহাস সৃষ্টিকারী মানুষের কর্মকাণ্ড।

রাজ্য সম্মেলনে প্রতিনিধিদের আলোচনাতেও কর্মচারী সহ সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ওপর নেমে আসা আক্রমণের বিরুদ্ধে জোরদার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলে প্রত্যাঘাতের দৃপ্ত প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। সম্মেলনে সামগ্রিক আলোচনার নির্যাস হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুসরণ করে বিভিন্ন জনবিরোধী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে রাজ্য সরকার। কেন্দ্রের সরকার যেমন রাষ্ট্রের অধীনে থাকা সমস্ত সম্পদ বেচে দেওয়া শুরু করেছে, তেমনি রাজ্য সরকারও বিভিন্ন সরকারী সম্পত্তি ও জমি বেসরকারী পুঁজিপতি ও প্রোমোটারচক্রের হাতে তুলে দিচ্ছে। কেন্দ্রের সরকার চাইছে দেশের জনগণকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করতে, আর রাজ্য সরকার সেই বিভাজন থেকে পরোক্ষে ফায়দা লুটতে চাইছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপে নাগরিকত্ব রক্ষার নামে যখন রাজ্যের সাধারণ মানুষকে বিপর্যস্ত করে তোলা হচ্ছে, তখন রাজ্য সরকার মেকি বিরোধিতার নামে পরোক্ষভাবে SIR প্রক্রিয়াকে মদত জুগিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা লাভ করতে চাইছে। আসলে এই উভয় সরকারই সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন যন্ত্রণার সমস্যাকে আড়াল করতে নানান অপকৌশল গ্রহণ করছে। রাজ্য প্রশাসনের সর্বত্র দুর্নীতি নিয়ে আদালত কঠোর অবস্থান গ্রহণ করার ফলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা মাঠে নামতে বাধ্য

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সংগ্রামী হাতিয়ার
ফেব্রুয়ারী ২০২৬
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
তেপান্নতম বর্ষ □ দশম সংখ্যা □ মূল্য ঃ ৪ টাকা

সম্পাদকীয়

নির্লজ্জ প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান

তীব্র বঞ্চনার মুখে দাঁড়িয়ে রাজ্যের কর্মচারী সমাজ গত ১৩ মার্চ এক ব্যতিক্রমী ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে নতুন ইতিহাস রচনা করলো। ব্যতিক্রমী কেন? কারণ সরকারের বিরুদ্ধে এই লড়াই শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দাবির জন্য নয়, এই লড়াই সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে বকেয়া মহার্ঘভাতাকে কেন্দ্র করে, তাকে কার্যকরী করার লড়াই। প্রকৃত অর্থে এই লড়াই রাজ্যে সংবিধান, গণতন্ত্র, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লড়াই। যে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে রাজ্যের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা সরকারকে বাধ্য করেছে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে কার্যকরী করতে। একথা ঠিক যে প্রতিবারের মতো কর্মচারীদের এই ধর্মঘটকে রোখার জন্য রাজ্য সরকার দায়িত্ব পালন করেছে 'ডায়াস্ নন'-এর আদেশনামা যথা সময়ে প্রকাশ করার মাধ্যমে, সঙ্গে ছিল সরকারের লেজুড় কর্মচারী সংগঠনগুলি সহ রাজ্যের শাসক দলের হুমকি। নির্লজ্জ এই কর্মচারী সংগঠনগুলি এত বঞ্চনা থাকা সত্ত্বেও সেই দাবিকে কেন্দ্র করে পথে তো নামেই না, বরং কর্মচারী সমাজ যখন মহার্ঘভাতার মতো সাধারণ দাবিকে কেন্দ্র করে ধর্মঘট ডাকে তখন শাসকের গেস্টাপো বাহিনীর মতো তারা সক্রিয় হয়ে ওঠে। একটা অংশের কর্মচারী সমাজ এদের দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ইচ্ছা থাকলেও ধর্মঘট করতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু এদের এই ভূমিকাকে অনুমোদন করছে কি? বরং এবারে রাজ্যের মানুষ দেখেছে মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের এক সাহসী ধর্মঘট, যেখানে শাসকের চোখে চোখ রেখে, আক্রমণকে রুখে দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে রাজ্যের সর্বত্র। ধর্মঘটীদের শরীরের ভাষাই সরকারকে রক্ষণাত্মক করেছে। ফলাফল ১৩ মার্চের ধর্মঘটের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই রবিবার ছুটির দিনে রাজ্য সরকার বাধ্য হয়েছে বকেয়া মহার্ঘভাতা ঘোষণা করতে। কিন্তু 'দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না', এখানেও তিন তিনটি আদেশনামার মধ্য দিয়ে সরকার দাগিয়ে দিলেন একটা বিভাজন রেখা। মহার্ঘভাতাকে কেন্দ্র করে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের মধ্যে বিবেচনায় ছিল 'Employees of the state of West Bengal' প্রসঙ্গ, আর রাজ্য সরকার বিবেচনায় নিলেন 'Employees of the Govt. of West Bengal' প্রসঙ্গ। Govt. আর state, দুটি শব্দের পার্থক্য হাড়ে হাড়ে টের পেলেন জাতির শিড়দাঁড়া নির্মাণের কারিগর শিক্ষক সহ অন্যান্য কর্মচারীরা। একদিকে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জন্য মার্চ ও সেপ্টেম্বরে দু'দফায় জানুয়ারি, ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিল সরকার। যদিও কারোকে হাতে, আর কারোকে পাতে, যেভাবে চাঁদ সওদাগর মনসা দেবীকে ফুল দিয়েছিলেন বাঁ-হাতে। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের জন্যও রইলো তার বরাভয়, কিন্তু অন্য দিকে 'ছাগলের তিন নম্বর সন্তান' শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সহ পঞ্চায়েত এবং বোর্ড কর্পোরেশনের শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য রইলো দীর্ঘশ্বাস। সরকার বাহাদুরের ভাষায়, এদের বেতন সংক্রান্ত তথ্য হাতে নেই, তাই আগে হিসাব করে সরকারকে এরা জানাবে তাদের কত প্রাপ্তিযোগ রয়েছে, তার ভিত্তিতে সরকার বাহাদুর 'কোনো এক সময়ে' ইচ্ছা প্রকাশ করবেন এদের দিকে চোখ তুলে তাকানোর। ধন্য, ধন্য তুমি হে সরকার, কখনো মাটিকে করো টাকা, আবার কখনো টাকাকে করো মাটি। মানুষের স্মৃতি বড়ই দুর্বল, তবু বেশি দিন আগের ঘটনা তো নয়। রোপা ২০০৯-এর এরিয়ারের টাকা তো সেই সময়ের সমস্ত শিক্ষক, কর্মচারী সমাজ পেয়েছিল তিন মাসের মধ্যেই। তখন তো তথ্য পেতে বা হিসাব কষতে কোনো সমস্যা হয়নি, কারণ সরকারটা ছিল প্রগতিশীলদের, যারা কর্মচারীদের সহকর্মীর মর্যাদা দিত। যদিও বিভেদের এই রাজনীতি আজকের সময়ে নতুন কোনো ঘটনা নয়, আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি দেশ জুড়ে কী চলছে এস আই আর-কে কেন্দ্র করে। রাজ্যে প্রায় ৬০ লক্ষের বেশি মানুষকে আজ 'লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি'-র নামে নির্বাচন তালিকার বাইরে রেখেছে এবং দুঃখের হলেও সত্যি, এদের বড় অংশটাই হলো কয়েকটি গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রে আজ গণতন্ত্রই আক্রান্ত হচ্ছে রোজ বিভাজনের রাজনীতির দ্বারা। আর আরেক দিকে পৃথিবীর সব থেকে 'গণতন্ত্র প্রিয় মানুষটি(!)' গণতন্ত্র আক্রান্ত হওয়ার দুঃখে অপর একটি সার্বভৌম দেশের গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকারের প্রধানকে রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে আসছে। এটাই এ বিশ্বের দস্তুর হিসাবে কেউ কেউ দেখলেও, সবাই কি অনুমোদন করছে এই গণতন্ত্র রক্ষার নামে 'ঘোমটার তলায় খেমটা নাচ'কে—না করছে না। তাই আজ আর মুখ বুজে সহ্য করা নয়, সোচ্চার হওয়ার দিন।

এটা ঠিক, ধর্মঘট করে আজ একটা জয় আমরা ছিনিয়ে নিয়ে আসতে পেরেছি, কিন্তু অমীমাংসিত আছে আরও বেশ কিছু দাবি। কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা, চুক্তিভিত্তিক ও অনিয়মিত শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষকের নিয়মিতকরণ, শূন্যপদে নিয়োগ, শিক্ষিত বেকার সন্তানের হাতে কাজ, পরিবারের প্রিয় মানুষগুলোর শিক্ষা-স্বাস্থ্য, নারীর মর্যাদা, আরও অনেক কিছু। রাস্তাটা দুর্গম, পথে রয়েছে অসংখ্য বাঁক; কিন্তু শিড়দাঁড়াটা সোজা রেখে যদি দাঁড়ানো যায় তবে নজরে আসে পথের শেষের সোনালী রেখা। সামনে রয়েছে নিয়োগকর্তার নির্বাচনের লড়াই। সেখানে সমস্ত প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে পরিবার-পরিজন সহ উপযুক্ত জবাব দেওয়ার শপথ আমাদের নিতেই হবে। □

১৯ মার্চ, ২০২৬

শোক সংবাদ

সুগত দাস

জিহ্বা ক্যান্সারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের শেষে প্রয়াত হলেন কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব তথা পশ্চিমবঙ্গ সেটলমেন্ট কর্মচারী সমিতির প্রাক্তন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও মুখপত্র ''ভূমিজ''-এর সম্পাদক সুগত দাস। তিনি গত ৪ মার্চ, ২০২৬ কলকাতার এক বেসরকারী হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। দীর্ঘদিন জিহ্বা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন কলকাতার এক বেসরকারী হাসপাতালে। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। সদালাপী, মিষ্টভাষী, বিনম্র স্বভাব, সাংগঠনিক দক্ষতা ছাড়াও অনুগামীদের সঙ্গে নিবিড় আত্মিক সম্পর্ক ইত্যাদি গুণ ছিল তাঁর। তিনি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ারের এডিটোরিয়াল বোর্ডের প্রাক্তন সদস্য ছিলেন।

চাকরি জীবন শুরু করেন হুগলী জেলায় একজন ড্রাফটসম্যান হিসেবে। পরবর্তীকালে তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বদলি হয়ে আসেন। জেলাতেও একজন প্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয় নেতা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সহ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নেতৃবৃন্দ। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও কন্যাকে রেখে গিয়েছেন। □

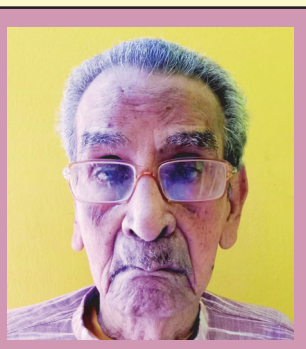

শিশির বিশ্বাস

রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের বর্ধমান জেলার প্রাক্তন নেতা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অবিভক্ত বর্ধমান জেলার প্রাক্তন জেলা সম্পাদক শিশির বিশ্বাস গত ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ বার্ধক্যজনিত কারণে স্বল্প রোগভোগের পরে বর্ধমান শহরের একটি বেসরকারী হাসপাতালে ৮৪ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ছাত্রাবস্থা থেকেই, বিশেষ করে ছয়ের দশকে তিনি বামপন্থী মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। যুব আন্দোলনেও তাঁর ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। ১৯৬২ সালে চাকরিতে যোগদানের সময় থেকেই তিনি কর্মচারী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন এবং আমৃত্যু শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির লড়াইয়ের মতাদর্শে অবিচল থাকেন। গত শতাব্দীর ৭০-এর দশকে রাজ্যে আধা ফ্যাসিস্ট সরকারের সময় তাঁকে প্রতিহিংসামূলক বদলি করা হয়, বর্ধমান থেকে দার্জিলিং জেলায় ও পরবর্তীতে আসানসোলে। রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর তিনি বর্ধমান জেলার ডি আই অফ স্কুল দপ্তরে বদলি হয়ে আসেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির (ডব্লিউ বি এম ও এ) জেলা সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৯৫ সালে বর্ধমান জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৮ সালে জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। অবসর গ্রহণের পর রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির সাথে যুক্ত হন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত সহজ সরল মনের অধিকারী। সদা হাস্যময় মানুষ ছিলেন। তাঁর অতি সাধারণ জীবনধারা বিশেষ ভাবে উদাহরণযোগ্য। সাধারণ গরিব মেহনতী মানুষের সুখ দুঃখের আমৃত্যু সাথী ছিলেন তিনি। তাঁর অমায়িক ব্যবহার ভীষণভাবে আকৃষ্ট করত মানুষকে। এলাকায় দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের মধ্যে একজন বামপন্থী মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নিজেকে।

তাঁর মরদেহ হাসপাতাল থেকে বর্ধমান কর্মচারী ভবনে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আনা হয় এবং সেখানে কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব সহ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত নেতৃত্বরা শেষ শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড শিশির বিশ্বাসের পুরো পরিবার বামপন্থী আন্দোলনের সাথে যুক্ত। প্রয়াত কমরেডের দুই পুত্র সহ পরিবার-পরিজন বর্তমান। □

মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

সদ্য স্বাধীন কলকাতার সাহেবপাড়ার জীবন। তার ভিতরে নানা মানবিক টানাপড়েন নিয়েই লেখা ''চৌরঙ্গী''। যাঁর কলম থেকে এই কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টি, সেই মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ওরফে ''শঙ্কর'' প্রয়াত হলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় সাহিত্যিক শঙ্করের সাহিত্য জীবনের শুরুটা ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল। তাঁর প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। অল্প বয়সে লেখা ''কত অজানারে'' তাঁকে পাঠক মহলে বিপুল পরিচিতি এনে দেয়। সেই বইয়ের সাফল্যই যেন তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য পথের ভিত্তি রচনা করে।

শঙ্করের একাধিক উপন্যাস বড় পর্দাতেও সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে। কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় তাঁর ''সীমাবদ্ধ'' ও ''জন অরণ্য'' উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এছাড়া চৌরঙ্গী উপন্যাস থেকেও তৈরী হয় জনপ্রিয় সিনেমা, যেখানে মুখ্য চরিত্রে স্যাটা বোসের ভূমিকায় অভিনয় করেন মহানায়ক উত্তম কুমার। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তিনি থেকে গেছেন পাঠকের অন্তরে। বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা সাহিত্যিক শঙ্কর বয়সজনিত কারণে দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। গত ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ বেলা পৌনে একটা নাগাদ কলকাতার এক বেসরকারী হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৩৩ সালের ৭ ডিসেম্বর অবিভক্ত ভারতের যশোর জেলায় (বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁ) শঙ্করের জন্ম। বাবা হরিপদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন পেশায় একজন আইনজীবী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি বোমার আতঙ্কের ভয়ে তাঁরা হাওড়ায় চলে আসেন। ১৯৪৭ সালে বাবার মৃত্যুর পর কিশোর বয়সেই তাঁকে সংসারের হাল ধরতে হয়। পড়াশোনা হাওড়া জেলা স্কুল, বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনে। পরবর্তীতে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ভর্তি হন। আর্থিক অনটনের জন্য পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া কঠিন ছিল। তাঁর কর্মজীবন ছিল অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। জীবনধারণের জন্য তিনি নানা ধরনের কাজ করেছেন। তিনি টাইপ রাইটার ক্লিনার, গৃহশিক্ষক এবং জুট বুকারের কনিষ্ঠ করণিক হিসেবে কাজ করেছেন। পরবর্তীতে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের শেষ ব্যারিস্টার নোয়েল বারওয়েলের মুহুরী হিসেবে কাজ করেছেন। কর্মজীবনে বাংলার অন্যতম প্রধান বণিক গোষ্ঠীর জনসংযোগের দায়িত্ব তিনি সামলেছেন। পরবর্তীকালে কর্পোরেট জগতে তিনি এক বিশিষ্ট নাম হয়ে ওঠেন।

সমকালের মধ্যবিত্ত বাঙালির সার্বিক সংকট থেকে মূল্যবোধের অবক্ষয় নিয়ে গড়ে উঠেছিল তাঁর উপন্যাসের শরীর। যেখানে বাঙালির জীবনের উচ্চাশা তার সঙ্গে আপোস এবং তা থেকে জন্মানো মানসিক সংকটের চেহারাটা স্পষ্ট হয়। তাঁর কালজয়ী সৃষ্টিগুলি প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাঙালি পাঠককে মুগ্ধ করেছে। তাঁর লেখনীর আধারে উঠে এসেছে সাধারণ মানুষের জীবনের সংগ্রামের না বলা কথা। আবার স্বামী বিবেকানন্দের জীবন নিয়ে শঙ্করের গবেষণা ও লেখাগুলি ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। ''ঘর ও বাহির'', ''পারিবারিক'', ''রসবতী'', ''চরণ ছুঁয়ে যায়'', ''একা একা একাশি'' তাঁর উল্লেখযোগ্য লেখা। ১৯৯৩ সালে ''ঘরের মাঝে ঘর'' উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন বঙ্কিম পুরস্কার। ২০১৬ সালে তিনি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি লিট সম্মানে ভূষিত হন। ২০২১ সালে তিনি সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পান। গণশক্তি পত্রিকার সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। নিয়মিত তিনি গণশক্তির শারদ সংখ্যায় লিখেছেন। গণশক্তি পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁর জীবনাবসানে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে। □

কে এন পানিক্কর

বিশিষ্ট মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ ও পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল কে এন পানিক্কর প্রয়াত হলেন, যিনি আধুনিক ভারতের ইতিহাস এবং ঔপনিবেশিক ভারতের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের গবেষণার জন্য সুপরিচিত। জে এন ইউ-এর অধ্যাপক হিসাবে তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা ও বৈজ্ঞানিক ইতিহাস চর্চার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার কট্টর সমালোচক। গত ৯ মার্চ, ২০২৬ তিরুবন্তপুরমে এক বেসরকারী হাসপাতালে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি ১৯৩৬ সালের ২৬ এপ্রিল কেরালার গুরুভায়ুরে জন্মগ্রহণ করেন। কমরেড পানিক্কর কেরালার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশোনা শেষ করে ওই প্রতিষ্ঠানেই অধ্যাপনার কাজে যুক্ত হন। তারপর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশনে কয়েক বছর শিক্ষকতা করে J.N.U. Center for Historical Studies-এর সঙ্গে যুক্ত হন। প্রায় চার দশক তিনি এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং ঔপনিবেশিক ভারতের সাংস্কৃতিক ও বৈদিক ইতিহাস অধ্যয়নে স্থায়ী অবদান রেখেছিলেন। তিনি ইতিহাসে সংস্কৃতি, রাজনীতি, ধর্ম ও সামাজিক আন্দোলনের মধ্যেকার সম্পর্কগুলি অন্বেষণ করেছিলেন। ২০০৮ সালে তিনি ভারতের ইতিহাস কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। দক্ষিণ ভারতের সামাজিক ইতিহাস, বিশেষ করে, প্রাক ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিক যুগে মালাবার উপকূল ও তার আশেপাশে শ্রেণী ও জাতিগত বৈষম্য এবং কৃষক অভ্যুত্থান নিয়ে তিনি বিশেষভাবে গবেষণা করেন। ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক কাঠামোর মার্কসীয় বিশ্লেষণে তাঁর এই কাজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সারা জীবন অসংখ্য বই ও প্রবন্ধ লেখেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ''ব্রিটিশ ডিপ্লোমেসি ইন নর্থ ইন্ডিয়া'', ''ন্যাশনাল এন্ড লেফট মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া'' এবং ''এগেইনস্ট লর্ড এন্ড স্টেট ঃ রিলিজিয়ান এন্ড পিজেন্ট আপরাইজিংস ইন মালাবার''। তিনি ''কৃষক প্রতিবাদ'' ও ''রিভোল্ট ইন মালাবার এন্ড ট্যুর্ার্ডস ফ্রিডম'', ''আ ডকুমেন্টারি হিস্ট্রি অফ দা ফ্রিডম স্ট্রাগল''-এর মতো সম্পাদিত খণ্ডের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ডকুমেন্টেশনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইতিহাস চর্চা এবং সমাজবিজ্ঞানের ধর্মনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রসারে পানিক্কর সারা জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁর এই দৃঢ় অবস্থানের জন্য ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত ভারত সরকারের দ্বারা তাঁকে হিন্দুত্ববাদীদের তীব্র আক্রমণের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তিনি উগ্র জাতীয়তাবাদের উত্থানের কঠোর সমালোচক ছিলেন। বিজেপি সরকারের আমলে স্কুল পাঠ্য বইয়ে হিন্দুত্ববাদীরা যে সমস্ত মনগড়া ভাষ্য অন্তর্ভুক্ত করে তা দেখতে ২০০৮ সালে কেরালা সরকার এক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। এই কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে তাঁকে নিযুক্ত করে কেরালা সরকার। শিক্ষার বাইরে তিনি শ্রী শংকরাচার্য সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, কেরালা রাজ্য উচ্চ শিক্ষা কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান এবং কেরালায় ইতিহাস কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, যা কিনা ভারতের উচ্চ শিক্ষা এবং ঐতিহাসিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে।

অধ্যাপক পানিক্কর শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং রাজনীতির উপর জনসাধারণের পক্ষে বিতর্কেও একজন নির্ভীক কণ্ঠস্বর ছিলেন। সাম্প্রদায়িকতার তীব্র সমালোচনা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার অটল প্রতিরক্ষা তাঁকে তাঁর প্রজন্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিজীবী কণ্ঠস্বরদের মধ্যে অন্যতম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিল।

তাঁর মৃত্যুতে বুদ্ধিজীবী মহল, মার্কসবাদী চিন্তাবিদ মহলেও গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। লং লিভ কমরেড পানিক্কর। □

জনবিরোধী কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বাজেট

বিদ্যুত দাস

গত ১ ফেব্রুয়ারী, রবিবার সকালে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সংসদে নবম কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেছেন। এই বাজেট সম্পূর্ণ জনবিরোধী, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বিরোধী এবং কর্পোরেট বান্ধব।

এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই বাজেট পেশ করা হয়েছে। গত ২৭ জানুয়ারী, '২৬ ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) অবাধ বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাজেট পেশের একদিন পরে ভারত-মার্কিন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যে চুক্তির বহু অংশ ভারতবাসী জানতে পারেনি। যতটুকু জানা গেছে তাতে ভারতের আর্থিক সার্বভৌমত্ব এবং বিদেশনীতি আমেরিকার নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে। অন্যদিকে ভারতীয় অর্থনীতি গভীর সঙ্কটে পড়েছে। যেমন, ভয়াবহ অর্থনৈতিক বৈষম্য যা গত একশো বছরে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে, দেশে চরম দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বেকার সংখ্যায় বিস্ফোরণ ঘটেছে যার মধ্যে ব্যাপক সংখ্যায় শিক্ষিত যুবসমাজ রয়েছে। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় সরকার উল্টোপথে হেঁটেছে।

দ্বিতীয়ত, যতদিন যাচ্ছে বাজেট সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে উত্তেজনা কমছে। কারণ বাজেট প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে সরকারের আর্থিক নীতি ও নিয়ন্ত্রণের একটি ভারসাম্যমূলক উদ্যোগের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়। কিন্তু গত এক দশকে মোদি সরকারের কৃতিত্ব হলো বাজেট নিয়ে খেটে খাওয়া মানুষের উৎসাহ কমিয়ে দেওয়া। সরকার যে কৌশলগুলি ব্যবহার করে তা হলো—১। সরকার কোনোরকম রাখঢাক না রেখেই বাজেট বহির্ভূত পথে কর্পোরেট তোষণ করে, ২। মূল্যবৃদ্ধি সারা বছর ধরেই চলে, এবং ৩। শ্রমজীবী মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ভয়ঙ্কর পদক্ষেপগুলিকে চিত্তাকর্ষক করে পেশ করে।

২০২৬-২০২৭ বাজেটকে এক প্রতারণার মহড়াও বলা যেতে পারে। কারণ বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ গরিব প্রান্তিক মানুষদের জন্য খরচ করা হয় না। যেমন গত এক বছরে তপশিলী জাতিদের জন্য বরাদ্দ অর্থ খরচ হয়নি ৭,২০০ কোটি টাকা, তপশিলী উপজাতিদের জন্য বরাদ্দ অর্থের মধ্যে খরচ হয়নি ৭ হাজার কোটি টাকা এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ অর্থ খরচ হয়নি ১৭ হাজার কোটি টাকা। মোদি সরকার নারীদের জন্য বরাদ্দ অর্থ খরচ করেনি ৫১ হাজার কোটি টাকা এবং শিশুদের জন্য বরাদ্দ অর্থ খরচ করেনি ৮ হাজার ২০০ কোটি টাকা। স্বভাবতই এই বাজেট উন্নয়নের বাজেট নয়, প্রতারণার এক অনুশীলন মাত্র।

বাজেটে অর্থমন্ত্রী তথাকথিত 'আর্থিক শৃঙ্খলা'-কে সরকারের কৃতিত্ব হিসেবে তুলে ধরেছেন; সেটি আসলে কর্পোরেট ও ধনীদের জন্য কর ছাড় দেওয়া এবং শ্রমজীবীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় সঙ্কোচন করে করা হয়েছে। ২০২৬-২০২৭ বাজেটে এর প্রতিফলন ঘটেছে রাজস্বের ব্যাপক সঙ্কোচন ও ব্যয়ের বিপুল কাটছাঁটের মাধ্যমে।

২০২৫-২০২৬ আর্থিক বর্ষে কর আদায়ের ক্ষেত্রে আয়কর ও জি এস টি রাজস্বের ঘাটতির একটি অংশ পূরণ করা হয়েছে আবগারি শুল্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে, যা মূলত তেলের উপর কর/মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে। স্বভাবতই ২০২৬-২৭ সালে আর্থিক ঘাটতি কমানোর লক্ষ্যে ব্যয় সঙ্কোচনের পথেই হাঁটবে সরকার এবং এর ফলেই শ্রমজীবীদের উপর আরো আক্রমণ চালানো হবে। যেমন গত আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিতে সহায়তার পরিমাণ ব্যাপক কাটছাঁট করা হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষেও সার, খাদ্য ও পেট্রোলিয়াম ভর্তুকিতে আরও কাটছাঁটের প্রস্তাব রয়েছে। দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সামগ্রিক বাজেট বৃদ্ধি করে দেশকে এক পুলিশ রাষ্ট্রের দিকে নিয়ে যাবে এই বাজেট—এই বলে সমালোচকরা কটাক্ষ করেছেন।

অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে ধারাবাহিক আর্থিক বৃদ্ধির দাবি করেছেন। কিন্তু ভারতের জি ডি পি হিসাবের সত্যতা নিয়ে আইএমএফ সন্দেহ প্রকাশ করেছে। একইসঙ্গে বাজেটে একাধিক কর সংক্রান্ত ঘোষণা থাকলেও, সেগুলির জন্য রাজস্ব কতটা বাড়বে বা কমবে তার কোনো হিসাব দেয়নি সরকার। অন্যদিকে দেশের তীব্র আর্থিক সঙ্কট কাটাতে সাধারণ মানুষের হাতে ক্রয়ক্ষমতা তুলে দেওয়া, জি ডি পি-র তুলনায় রাজস্ব ঘাটতির হার বাড়তে না দেওয়া, ধনীদের উপর কর আরোপ করা যার মধ্যে দিয়ে ভোগের চাহিদা বাড়বে, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং করোত্তর আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্যও কমবে, এই বিষয়গুলি বাজেটে উপেক্ষা করা হয়েছে। অথচ প্রাক বাজেটে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলির সাথে সরকারের আলোচনায় বিষয়গুলি উত্থাপন করা হয়েছিল, সরকার ঠিক উল্টো পথে হেঁটেছে। জিডিপি-র অনুপাতে মোট কর আয় বাড়ার বদলে কমেছে। ১১.৪ শতাংশ থেকে (২৫-২৬) ২০২৬-২০২৭-এ নামিয়ে আনা হয়েছে ১১.২ শতাংশে। রাজস্ব ঘাটতির ক্ষেত্রে ৪.৪ শতাংশ (২০২৫-২০২৬) থেকে ২০২৬-২০২৭-এ ৪:৩ শতাংশে আনার কথা বলা হলেও ধনীদের উপর কর আরোপের কথা বলা হয়নি।

বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকারের মূলধনী খাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে জিডিপি-র ৩.১ শতাংশ স্থির করা হয়েছে। যে অংশে পুঁজি বাড়ছে বলে দেখানো হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে VB-G RAM-G-র দায়ভার, যা রাজ্যগুলির উপর চাপানো হয়েছে। এমনিতেই ২০২৫-২০২৬ সালে বিভিন্ন সহায়তা প্রকল্প, অনুদান সহ অন্যান্য বিষয়ে রাজ্যগুলির বরাদ্দ বাজেট অনুমানের তুলনায় ২,০৩,৮০১ কোটি টাকা কমানো হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০২৬-২০২৭ সালের বাজেটে ২০২৫-২০২৬ সালের বাজেট অনুমানের তুলনায়

আরও ৫৯,৪৫৬ কোটি টাকা কমানোর প্রস্তাব রয়েছে। ১৪তম অর্থ কমিশনের সুপারিশে রাজ্যগুলির কর অংশ ৪২ শতাংশ প্রদানের নির্দেশ ছিল। কিন্তু কর ও রাজস্ব বাবদ রাজ্যগুলিতে ৩৪ শতাংশের বেশি হতে দেয়নি। যেগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরোধী বা সম্পদের বেআইনি কেন্দ্রীকরণ।

এই বাজেটে গভীর কর্মসংস্থানের সঙ্কট নিরসনে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। দেশে প্রকৃত মজুরি বাড়ছে না। স্বনিযুক্তির ক্ষেত্রে অবনতি, কাজের আকাল। এর প্রভাব পড়েছে ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং কর্পোরেট ক্ষেত্রে, যেখানে বিনিয়োগও কম হচ্ছে। আমেরিকার সাথে অসম বাণিজ্য চুক্তি ও শুল্ক বৃদ্ধির ফলে অন্যান্য ক্ষেত্র সহ কৃষিক্ষেত্রকে ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। পাশাপাশি গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের চরিত্র বদলে দিয়ে রাজ্যগুলির ব্যয়ের অংশ বৃদ্ধি করে দিয়েছে বিকশিত ভারত রোজগার ও আজীবিকা গ্যারান্টি মিশন (গ্রামীণ) আইনের মাধ্যমে। এতে বেকারত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে। কারণ বেশির ভাগ রাজ্য আর্থিকভাবে এই প্রকল্প চালিয়ে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হবে। একই সাথে ২০২৭ সালে মাথা পিছু মাসে ৫ কোটি বিনামূল্যের খাদ্য শস্য প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাবে। স্বভাবতই এই বাজেট দারিদ্র্য ও বেকারত্ব বৃদ্ধির বাজেট। ২০১৯ সালে কর্পোরেট কর ছাড়ের পরও বিনিয়োগ বাড়েনি, তবুও সরকার কর ছাড় দিয়ে কর্পোরেটদের তুষ্ট করার চেষ্টা করে চলেছে।

উদার অর্থনীতির বেপরোয়া পৃষ্ঠপোষক কেন্দ্র সরকার চাইছে না মানুষের হাতে কাজ ও আয় বৃদ্ধি ঘটুক। স্বভাবতই চাহিদা না বাড়লে বিনিয়োগ বাড়বে না, কর্মসংস্থানও বাড়বে না।

এই পরিস্থিতিতে মোদি সরকারের সময়কালে শ্রমজীবী মানুষের দুর্দশার বেপরোয়া বেকারত্ব ও সীমিত আয়ের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে ধনী ও কর্পোরেটদের আয় ও সম্পদ ধারাবাহিক বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৬-২০২৭ সালের বাজেট এই বৈষম্যকেই আরো বৃদ্ধি করবে, একইসঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতিতে সঙ্কট বৃদ্ধি পাবে এবং কর ছাড় দিয়ে পুঁজি টানার উদ্যোগও ব্যর্থ হবে।

রাজ্য বাজেট ঃ

গত ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬, পশ্চিমবঙ্গের অর্থ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ২০২৬-২০২৭ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করেন। আগামী এপ্রিল মাসে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। ৩১ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত বর্তমান সরকার পরিচালনার জন্য ব্যয় মঞ্জরী পূর্বেই গৃহীত হয়েছে। শুধুমাত্র এপ্রিল '২০২৬ থেকে চার মাসের জন্য 'ভোট অন এ্যাকাউন্ট'-এর মাধ্যমে অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করার কথা সরকারের। কিন্তু নতুন প্রকল্প ও ভাতা ঘোষণা সহ কার্যত পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেছে তৃণমূল সরকার। আগামী মে মাসে নতুন সরকার ক্ষমতায় এলে আবার বাজেট হবে। সেই অর্থে এই বাজেট অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট।

৪,০৬,০৮৪.১৭৬ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছে তৃণমূলের সরকার। গত বাজেটের থেকেও ১৪.২ শতাংশ বেশি। এই বাজেটের দুটি দিক—একদিকে ভাতা, অন্যদিকে ঋণ গ্রহণ। 'বাংলার যুব সাথী' নামে (২১-৪০ বছর পর্যন্ত) নতুন প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। এই জন্য ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মাত্র ৫ বছর, ১,৫০০ টাকা করে কর্মপ্রার্থীরা এই টাকা পাবেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেলে এই টাকা পাবেন না। বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে বছরে প্রায় ২৭,৭৭,৭৭৭ জন কর্মপ্রার্থী এই ভাতা পেতে পারেন। পাশাপাশি যুবশ্রী প্রকল্পের কী হবে স্টো উল্লেখ করা হয়নি।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ৫০০ টাকা বাড়ানো হলেও সারা রাজ্যে লক্ষ্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি সরকার। খেতমজুরদের বছরে ৪ হাজার টাকা দেওয়া হবে। কৃষকবন্ধুরা সুবিধা পান না, ভাগচাষী নন এমন খেতমজুররাই এই টাকা পাবেন। যদিও এই প্রকল্পের জন্য কোনো বরাদ্দ করা হয়নি, তবে মাত্র ৪ হাজার টাকা খেতমজুরদের জন্য সামান্যই।

রাজ্যে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ 'মিড ডে মিল' কর্মীদের দাবি পূরণের জন্য কোনো ঘোষণাই নেই। দীর্ঘদিন পর অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সহায়িকা শিক্ষাবন্ধু, সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ, প্যারা টিচারদের জন্য মাত্র ১ হাজার টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

গিগ কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির আওতায় আনার কথা বলা হলেও এর জন্য কোনো অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের কথা বলা হয়নি।

রাজ্য কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্তদের জন্য কেবলমাত্র ৪ শতাংশ ডি.এ. / ডি.আর. ঘোষণা করা হলেও ৩৬ শতাংশ বকেয়া প্রদান প্রসঙ্গে কিছু বলা হয়নি। একই সঙ্গে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী বকেয়া ২৫ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদান প্রসঙ্গে সরকার নিরব থেকেছে। অথচ গত ৬ বছরে মোট ৫১ জন আইনজীবীর ফি বাবদ ৮৭ কোটি ৭৭ লক্ষ ১৭ হাজার ৪৪৯ টাকা খরচ করেছে তৃণমূল সরকার। বাজেটে ৭ম বেতন কমিশন গঠনের ঘোষণা থাকলেও তার কোনো কার্যকরী উদ্যোগের কথা নেই এবং হেল্‌থ স্কিমে ক্যাশলেস সুবিধা নামমাত্র বৃদ্ধি করা হয়েছে।

রাজ্যের ভাতামুখী বাজেটের ফলে আগামী বছর রাজ্যে ঋণ দাঁড়াবে ৮,১৫,৮৯১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। এক বছরে বাজার থেকে ঋণ গ্রহণ করা হবে ৮০,৪৪৪ কোটি টাকা। বর্তমান আর্থিক বছরে ধার করা হয়েছে ৮০ হাজার কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় বাজেটের মতোই রাজ্যের বাজেটও জনস্বার্থ বিরোধী ও কর্মসংস্থান বিরোধী। গত ১৫ বছর ধরেই এই রাজ্যে কর্মসংস্থানে ব্যর্থ তৃণমূল সরকর। সরকারী ক্ষেত্রে ৬.৫ লক্ষ শূন্যপদ পূরণ করা হচ্ছে না। পাশাপাশি নিয়োগের সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্ক, উৎপাদন বাড়লে নিয়োগ বাড়ে। কিন্তু উৎপাদন কমছে সবক্ষেত্রেই। যেমন কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজে, শিল্প, নির্মাণ, ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে। কিছু সাধারণ কাজ থাকলেও শিক্ষিত বেকারদের জন্য এই রাজ্য মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। জীবিকার সন্ধানে বহু শিক্ষিত কর্মপ্রার্থী ভিন্ রাজ্যে, এমনকি বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন। এই সমস্যার সমাধানে পুরোপুরি ব্যর্থ তৃণমূল সরকার।

বাজেটে বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যয় বরাদ্দ কমানো হয়েছে। তপশিলী জাতি, উপজাতি, অনগ্রসর কল্যাণ খাতে গত বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছিল ৮,২১৮ কোটি ২১ লক্ষ টাকা; ২০২৬-২০২৭ বাজেটে কমিয়ে ৬৯১৪ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থা, আবাসনে গত বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৪৮,৭২০ কোটি ১ লক্ষ টাকা, ২০২৬-২০২৭ বাজেটে কমিয়ে বরাদ্দ করা হয়েছে ৪৫,৫৪৪ কোটি টাকা। বেশ কিছু প্রকল্পে সরকার বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করছে না। যেমন সামাজিক পরিষেবা ক্ষেত্রে গত বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১,৫৮,৮৭৯ কোটি টাকা, বছরের শেষে খরচ দাঁড়াবে ১,৪৭,৫৮৫ কোটি টাকা। চলতি খাতে ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩,০১,৩৭৫ কোটি টাকা, মার্চ '২৬-র মধ্যে খরচ হবে ২,৯৬,০০০ কোটি টাকা। মূলধনী খাতে খরচের জন্য গত বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৭২,৮১৮ কোটি টাকা, কিন্তু খরচ হয়েছে ৬০,৬৬১ কোটি টাকা।

শিক্ষাক্ষেত্রে গত বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছিল ৫০,৫৫৯ কোটি টাকা, কিন্তু খরচ করা হয়েছে ৩৬,২৬২ কোটি টাকা। ২০২৬-২৭ বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে ৫১ হাজার ৫৩০ কোটি টাকা। এই টাকা খরচ কীভাবে হবে?

সাফল্যের দাবির সঙ্গে বাজেটে গৃহীত পদক্ষেপ পরস্পর বিরোধী। দাবি করা হয়েছে কৃষকের আয় চার-পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণভাবে কৃষকের আয় চার-পাঁচ গুণ বাড়লে খেতমুজরদেরও আয় বাড়বে। তাহলে খেতমজুরদের জন্য বছরে ৪ হাজার টাকা ভাতা ঘোষণা করা হলো কেন?

দাবি করা হয়েছে কোটি কোটি কর্মসংস্থান করা হয়েছে, বেকারের সংখ্যা কমে গেছে। অথচ বাজেটে নতুন ভাবে বেকারভাতা চালু করতে হলো। যদিও কাজের সুযোগ তৈরী, রোজগারের পথ দেখানোর দিশা নেই বাজেটে। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য কোনো প্রকল্প প্রস্তাবের কথা নেই। বলা হয়েছে, রাজ্যে দারিদ্র্য কমেছে। তবে কেন বিনামূল্যে রেশন দিতে হচ্ছে? বিভিন্ন ভাতা দিতে হচ্ছে? একই সাথে মূল্যবৃদ্ধিকে হিসাবে রাখলে এই বাজেট রাজ্যের অর্থনীতিকে আরো সঙ্কুচিত করবে। আসলে স্থায়ী সম্পদ তৈরী, উন্নত পরিকাঠামো গড়তে, শিল্পের জন্য বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরী করা, ন্যায্য মজুরির কাজ নিশ্চিত করা, ডিয়ার লটারী ও মাইক্রো ফিনান্সের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে বাজেটে কিছু উল্লেখ করা হয় নি। উভয় জনবিরোধী বাজেটের বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রচার করতে হবে আমাদের। □

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ১৮তম সর্বভারতীয় সম্মেলনের বার্তা

নয়া ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের রণাঙ্গন হোক আরো বিস্তৃত

শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব দাবি দাওয়ার আন্দোলনের সাথে কেন্দ্রীয় সরকার ও তাদের তল্পিবাহক কিছু রাজ্য সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে এবং শ্রমিক শ্রেণীর অর্জিত অধিকার রক্ষা করতে শ্রমকোড বাতিল, সর্বত্র সামাজিক সুরক্ষা ও মজুরি

উদ্বোধক, সর্বভারতীয় শ্রমিক নেতা তপন সেন

বৃদ্ধির লড়াইকে, অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ, নতুন পেনশন স্কীম বাতিল, সমকাজে সমবেতনের লড়াইকে তীব্র করতে দেশ জুড়ে ১২ ফেব্রুয়ারী সাধারণ ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানিয়ে শেষ হয়েছে রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ১৮তম জাতীয় সম্মেলন।

২৩ থেকে ২৬ জানুয়ারী, ২০২৬ এই মহতী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে মহারাষ্ট্রের শিরডির সাই কি মায়া গার্ডেনে কমরেড অশোক থুলের নামাঙ্কিত মঞ্চে। সম্মেলন উপলক্ষে শিরডি শহরের নামকরণ করা হয়েছিল আর জি কার্নিক নগর।

দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ৭১২ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে

পুনর্নির্বাচিত ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ সদস্য দেবব্রত রায়

উপস্থিত ছিলেন—যার মধ্যে মহিলা ছিলেন ১৭৫ জন। ৩০ বছরের নীচে প্রতিনিধি ছিলেন ১৯ জন। ১৬৮ জন প্রতিনিধি সাংগঠনিক কারণে বিভিন্ন সময়ে পুলিশ দ্বারা আটক ছিলেন। মহারাষ্ট্র স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ কনফেডারেশন ও মহারাষ্ট্র জিলা পরিষদ এমপ্লয়িজ কনফেডারেশনের নেতৃত্বে অভ্যর্থনা কমিটি দ্বারা সম্মেলনের ব্যবস্থাপনা সার্বিকভাবে ছিল অতুলনীয়, অভিনন্দনযোগ্য।

২৩ জানুয়ারী সম্মেলন শুরুর পূর্বে একটি সংক্ষিপ্ত শ্লোগান মুখরিত দৃপ্ত মিছিল অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সংগঠনের রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধা জানানোর কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সভাপতি সুভাষ লাম্বা। এরপর শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন উপস্থিত নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিরা।

উদ্বোধনী অধিবেশন ঃ উদ্বোধনী অধিবেশনে উদ্বোধক তপন সেন, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃত্ব ও ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল অফ

পুনর্নির্বাচিত সহ সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

পাবলিক সার্ভিসের প্রতিনিধি ডেসমন্ড স্লাথা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সভাপতি সুভাষ লাম্বা।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সর্বভারতীয় শ্রমিক নেতা তপন সেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে শ্রেণী ঐক্য তীব্র করে মোদী সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। শ্রমকোড বাতিল ও দেশের শ্রমজীবী জনগণের ওপর আক্রমণ বন্ধের দাবিতে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারী সংগঠনের ভূমিকা কী হবে তা নির্দিষ্ট করে দেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে দৃঢ়তার সাথে

নবনির্বাচিত ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ সদস্য শাশ্বতী মজুমদার

ঘোষণা করেছেন বর্তমান সময়ে শ্রমিক আন্দোলন শুধু শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা, দাবি আদায়ের জন্য নয়, এ লড়াই দেশকে ও দেশের জনগণকে নয়া ফ্যাসিস্ট আক্রমণ থেকে রক্ষা করার লড়াই। ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়নগুলির ঐক্যকে আরো দৃঢ় করে এই লড়াইতে ভূমিকা প্রতিপালন করতে হবে।

পুনর্নির্বাচিত সভাপতি সুভাষ লাম্বা

উদ্বোধক ছাড়াও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মহারাষ্ট্রের শ্রমিক নেতা তথা অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ ডি এস কারাদ, অভ্যর্থনা কমিটির আহ্বায়ক ভিশ্বাস কাটকার, সাইবাক ট্রাস্টের প্রতিনিধি গাইকার, ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার নেতা এস এস অনিল, অল ইন্ডিয়া লোকো রানিং স্টাফ এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কে সি জেমস, বি এস এন এল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অনিমেষ মিত্র, ফেডারেশন অফ মেডিকেল এন্ড সেলস্ রিপ্রেজেনটেটিভ এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নরেন্দ্র সিং, সারা ভারত রাজ্য সরকারী পেনশনার্স

সংগঠনের নীতিগত প্রসঙ্গে আলোচনা করছেন সুমন কান্তি নাগ

সমিতির নেতৃত্ব সুরেন্দ্র চৌধুরী প্রমুখ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির যুগ্ম সাধারণ আহ্বায়ক উমেশ চন্দ্র চিলবুলে।

প্রতিনিধি অধিবেশন ঃ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরবর্তীতে ২৩ জানুয়ারী বিকেল ৩টে থেকে শুরু হয় প্রতিনিধি অধিবেশন। অধিবেশনের শুরুতেই সাধারণ সম্পাদক সম্মেলন পরিচালনার জন্য সভাপতিমণ্ডলী ও বিভিন্ন সাবকমিটির নামের প্রস্তাব রাখেন, যা সভাতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভাপতিমণ্ডলী ও বিভিন্ন সাবকমিটির সদস্যরা দায়িত্ব গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়।

সম্মেলন মঞ্চে **ওয়ার্কস রিপোর্ট** পেশ করেন অন্যতম সহ-সম্পাদক এম এ অমিত কুমার। ওয়ার্কস রিপোর্টের উপর বিভিন্ন রাজ্যের ২৫ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে আলোচনায় অংশ নেন প্রণব কর।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন অন্যতম সহ-সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। সম্পাদকীয়

পুনর্নির্বাচিত কোষাধ্যক্ষ শশীকান্ত রাই

প্রতিবেদনের উপর রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে শাশ্বতী মজুমদার সহ ৬৮ জন বক্তা আলোচনায় অংশ নেন।

নিরীক্ষিত হিসেব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ শশীকান্ত রাই।

প্রস্তাব পেশ ঃ সম্মেলনে ২০টি প্রস্তাব পেশ ও তার সমর্থনে বক্তব্য পেশ করা হয়। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্ব সুতপা হাজরা সহ ৪০ জন এতে অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করে এবং আগামীতে শ্রমিক কর্মচারী স্বার্থবিরোধী শ্রমকোডের বিরুদ্ধে জাতীয় সম্মেলনের সামনে ১২ ফেব্রুয়ারী,

ওয়ার্কস রিপোর্টের উপর আলোচনারত প্রণব কর

২০২৬ আহূত ধর্মঘটে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য পেশ করেন সি আই টি ইউ-র অন্যতম সম্পাদিকা এ আর সিন্ধু।

সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য পেশ করেন ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল অফ পাবলিক সার্ভিস (TUI)-এর সাধারণ সম্পাদক জোলা সাপেথা।

সংবিধান সংশোধন ও

পুনর্নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার

নীতিগত প্রস্তাব ঃ সম্মেলনে সংগঠনের সংবিধান সংশোধন ও সংগঠনের নীতিগত প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রতিনিধি সুমন কান্তি নাগ সহ বিভিন্ন রাজ্যের কমরেডগণ এই আলোচনায় অংশ নিয়েছেন।

জবাবী বক্তব্য ঃ সম্মেলনে পেশ করা ওয়ার্কস রিপোর্ট, সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট ও নীতি প্রসঙ্গে কর্মসূচী এবং তার উপর প্রতিনিধিদের ৬০০ মিনিট ধরে আলোচনার পরবর্তীতে সমস্ত বক্তব্য গুটিয়ে জবাবী ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার। গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করেন।

সাধারণ সম্পাদকের জবাবী বক্তব্যের পর সম্মেলন থেকে আগামী দিনের কমিটি নির্বাচিত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন সুভাষ লাম্বা, সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার, সহ-সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী এবং এম এ অজিত কুমার। কোষাধ্যক্ষ পুনর্নির্বাচিত হন শশীকান্ত রাই, সহ-কোষাধ্যক্ষ হন এস জয়কুমার।

সম্মেলন থেকে ১৩৭ জনের ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠিত হয়।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি থেকে বিশ্বজিৎ গুপ্ত

পুনর্নির্বাচিত সহ সভাপতি সুতপা হাজরা

চৌধুরী, সুতপা হাজরা, দেবব্রত রায় ও শাশ্বতী মজুমদার ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসাবে নির্বাচিত হন। □

রজত সাহা

সম্মেলনের সমগ্র প্রতিনিধিবৃন্দ

সম্মেলনের মহিলা প্রতিনিধিবৃন্দ

একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন থেকে নব-নির্বাচিত পদাধিকারীদের নামের তালিকা

● **সভাপতি**—মানস দাস ● **সহ-সভাপতি**—সুতপা হাজরা, পিঙ্কু ব্রহ্ম, জয়দেব হাজরা

● **সাধারণ সম্পাদক**—বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী ● **যুগ্ম-সম্পাদক**—দেবব্রত রায় ● **সহ-সম্পাদক**— প্রণব কর, শাশ্বতী মজুমদার

● **কোষাধ্যক্ষ**—প্রশান্ত চন্দ ● **দপ্তর সম্পাদক**—বাপ্পা দাস ● **সংগ্রামী হাতিয়ার সম্পাদক**—সুমন কান্তি নাগ ● **সংগ্রামী হাতিয়ার সহযোগী সম্পাদক**—বিদ্যুত দাস।

কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ মানস কুমার বড়ুয়া, উৎসর্গ মিত্র, সুদীপ সামন্ত, সৌমেন দত্ত, বাবলু ঘোষ, অরুণাংশু ভট্টাচার্য, রজত সাহা, অরূপ চন্দ, গোরাচাঁদ সরদার, দীপঙ্কর বাগচী, রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়, নিবেদিতা দাশগুপ্ত, লিটন পান্ডে, অতনু মিত্র, দেবলা মুখার্জী, মানিক শঙ্কর মৈত্র, কণিকা টুডু, আশিস মজুমদার।

মানস দাস

সুতপা হাজরা

পিকু ব্রহ্ম

জয়দেব হাজরা

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

দেবব্রত রায়

প্রণব কর

শাশ্বতী মজুমদার

প্রশান্ত চন্দ

বাপ্পা দাস

সুমন কান্তি নাগ

বিদ্যুত দাস

মানস কুমার বড়ুয়া

উৎসর্গ মিত্র

সুদীপ সামন্ত

সৌমেন দত্ত

বাবলু ঘোষ

অরুণাংশু ভট্টাচার্য

রজত সাহা

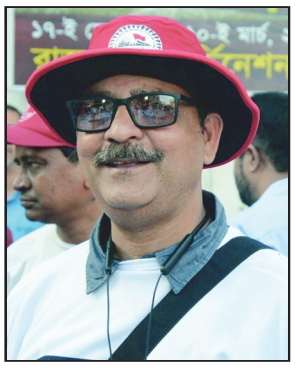
অরূপ চন্দ

গোরাচাঁদ সরদার

দীপঙ্কর বাগচী

রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়

নিবেদিতা দাশগুপ্ত

লিটন পান্ডে

অতনু মিত্র

দেবলা মুখার্জী

মানিক শঙ্কর মৈত্র

কণিকা টুডু

আশিস মজুমদার

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই প্রতিরোধের একমাত্র পথ

হলেও কোনো এক অদৃশ্য সুতোর টানে তাঁদের তৎপরতা নিস্পৃহ হয়ে যাওয়ায় দুর্নীতিকারীরা ছাড়া পেয়ে প্রকাশ্যে দাপাদাপি করছে। প্রশাসনে বিপুল শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও স্থায়ী শূন্যপদে নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না করে স্বল্প বেতনে অস্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ করা হচ্ছে। সেই নিয়োগ প্রক্রিয়াতেও অস্বচ্ছতার প্রতিফলন ঘটেছে। অস্থায়ী কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ সহ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে চুক্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের পৃথক কাঠামো গঠিত করে তাদের দাবি নিয়ে যৌথ লড়াই সংগঠিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন।

বকেয়া মহার্ঘভাতা নিয়ে রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত উপেক্ষার বিষয়টিও আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। এর বিরুদ্ধে বৃহত্তর ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে রাজ্য সম্মেলন। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট নির্ধারিত মহার্ঘভাতার বকেয়া অর্থ প্রদানের নির্দেশকে নানা অছিলায় অমান্য করতে চায় রাজ্য সরকার। বিস্ময়কর বিষয় হলো, এমনকি অতি বড় নিরাশাবাদীও যা কখনও আশঙ্কা করেননি, তা হলো আদালতের রায়কে উপেক্ষা করার মতো কদর্য রাজনৈতিক প্যাঁচ-পয়জার। গণতন্ত্রকে লাটে তুলে দেওয়া মিলিটারি শাসনেও যা ভাবা যায় না, তা-ই গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে চাপিয়ে অবলীলায় যারা করতে পারে, তাদের একমাত্র প্রাপ্য বিপুল ক্ষোভ আর তীব্র ঘৃণা মেশানো মু-তোড় জবাব। একটাই ভাষা যা এদের অনুভূতিহীন ভোঁতা স্নায়ুতন্ত্রে 'কারেন্ট' মারতে পারে, তা হলো রাজ্য প্রশাসনে, রাজ্য প্রশাসনের অধিগৃহীত সংস্থায়, পঞ্চায়েত ও বোর্ড-কর্পোরেশন দপ্তরে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিশ্ছিদ্র ধর্মঘট। কারণ বকেয়া মহার্ঘভাতা মানে শুধু কিছু টাকার বিষয় নয়। এর সাথে জড়িয়ে রয়েছে আমাদের অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্ন। রাজ্য সম্মেলনের আহ্বানকে পাথেয় করে গত ১৩ মার্চের ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘট ছিল এমনই জানকবুল লড়াইয়ের দিন। 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' গোছের সুবিধাবাদ, সাংগঠনিক মতপার্থক্য প্রভৃতি 'দ্বিধা' সৃষ্টিকারী উপাদানগুলিকে একপাশে সরিয়ে রেখে ১৩ মার্চের ধর্মঘটকে ঐতিহাসিক ধর্মঘটে পরিণত করতে পেরেছে। কারণ সরকারী কর্মচারীদের ওপর শোষণ, বঞ্চনা, দমন-পীড়নের শ্বাসরোধকারী পরিবেশের পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন। তবে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটবে না। সম্মিলিত শক্তি দিয়েই তা করতে হবে। রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্য সংগঠিত-অসংগঠিত অংশের শ্রমজীবী মানুষের লড়াইয়ের ক্ষেত্র আলাদা কিন্তু অভিমুখ অভিন্ন। শ্রমজীবী মানুষের লড়াই-আন্দোলনে বিভ্রান্তির বীজ বপন করতে তাদের খণ্ড খণ্ড রূপ দিতে চাইছে কর্পোরেটমুখী দক্ষিণপন্থী শক্তি। বর্তমান সময়ে আক্রমণের বহুমাত্রিকার মধ্য দিয়ে পথ পরিক্রমা চলছে। আড়াই দশকের বেশি সময় ধরে পুঁজিবাদ বেপরোয়া। ফলে লড়াই-সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত অধিকার হরণ করে মুনাফাকে স্ফীত করছে। আরও মুনাফার লোভে রাষ্ট্রের কল্যাণকামী ভূমিকাকে খর্ব করা হচ্ছে। নিয়মিত স্থায়ী অংশের পরিবর্তে চুক্তি, এজেন্সি, আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে কাজ চলছে। বল্গাহীন শোষণকে মসৃণ করতে একতরফাভাবে শ্রমিক স্বার্থে সৃষ্ট শ্রম আইনকে বাতিল করে শ্রমকোডের আওতায় আনা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে যাদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধে সোচ্চারিত হওয়ার কথা তাদের একাংশ সাময়িক বিভ্রান্তিতে বিশ্বায়িত ব্যবস্থার সমর্থক হয়ে উঠছে। কেউ কেউ শ্রেণী অবস্থানকে ভুলে গিয়ে সমঝোতা করতেই অভ্যস্ত। একদিকে উগ্র দক্ষিণপন্থী, উগ্র জাতীয়তাবাদী, উগ্র ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা মনমোহিনী শ্লোগান দিয়ে পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় প্রচারের মুখোশে মুখ ঢেকে উন্নয়নের মেকি তত্ত্ব তৈরী করে বেড়াচ্ছে। উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা রাজ্যে শক্তিবৃদ্ধি করতে সবরকম সহায়তা পাচ্ছে। স্বভাবতই শ্রমজীবীদের আন্দোলন মুখরিত সংহতি আজ আক্রান্ত। কিন্তু আন্দোলন-সংগ্রামের বাস্তবতা হারিয়ে যায়নি। বরং অনেক বেশি সম্ভাবনা প্রতিদিন বিকশিত হচ্ছে, তৈরী হচ্ছে লড়াই-আন্দোলনের নতুন নতুন ক্ষেত্র। নির্দিষ্ট দাবিতে তৈরী হওয়া মঞ্চের সাথে যৌথ সংগ্রামে সকল কর্মচারী জনমানসকে নাড়া দিতে পেরেছে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সাফল্যকে ধারণ করে আরও বৃহত্তর সংগ্রামে যুক্ত হওয়ার চাহিদা ব্যক্ত হয়েছে ময়দানের লড়াই থেকে। হিংস্র আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইকে সংহত করতে চাই ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর শক্তি। সম্মিলিত শক্তিই পারে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে। সেই মতো, যৌথ মঞ্চের পরিধিকে প্রসারিত করে প্রশাসনকে পুনরায় স্তব্ধ করে দেওয়ার মতো বৃহত্তর সংগ্রামে যাওয়া হয়েছে। এই ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের ধর্মঘট প্রমাণ করে দিয়েছে সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে শাসককে দাবি মানতে বাধ্য করা যায়। সুপ্রিম কোর্টের রায় কার্যকর করার দাবি নিয়ে গত ১৩ মার্চ রাজ্যের শ্রমিক-কর্মচারীরা ধর্মঘটে শামিল হলে প্রশাসন ও শাসকদলের দুষ্কৃতীরা নানান ভাবে ধর্মঘটীদের ওপর চড়াও হয়। ভীতি প্রদর্শন, হুমকি, শারীরিকভাবে আক্রমণ, জেলবন্দী করেও ধর্মঘটীদের লড়াকু মেজাজের কাছে কার্যত হার মানে রাজ্য সরকার। যে সরকার কোর্ট নির্ধারিত বকেয়া প্রদানে দীর্ঘ টালবাহানা করেছে, সেই সরকার সফল ধর্মঘট পরবর্তীতে রাজ্য কর্মচারীদের বকেয়া ডি.এ. প্রদান ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ট্যুইট করে তা ঘোষণা করেন। যদিও কার্যক্ষেত্রে এই সরকারের ঘৃণ্য অপকৌশলেরই প্রতিফলন ঘটে। নির্বাচনী চমকের নামে রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত রাজ্য কর্মীদের মধ্যে বিভাজন তৈরীর অপচেষ্টা জারি থাকে। এই বিভাজন করার চেষ্টার বিরুদ্ধে মহার্ঘভাতা সংক্রান্ত রায় নির্দিষ্ট সময়ে সঠিকভাবে সকল অংশের জন্য কার্যকরী করার দাবিতে আগামীতে বৃহত্তর ধারাবাহিক সংগ্রামে যেতে হবে, যার পথ দেখিয়েছে একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন।

রাজ্য প্রশাসনের অধিকাংশ কর্মচারী অস্থায়ী। স্বল্প বেতনে বেপরোয়াভাবে আংশিক ও অস্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এই অংশের কর্মচারীদের অর্থনৈতিক ও অধিকারগত বঞ্চনার বিরুদ্ধে ন্যায্য দাবি অর্জনে সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন। স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মচারীর মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করতে নানান কৌশল গ্রহণে মরিয়া শাসক শ্রেণী। তাই অপকৌশলকে ছিন্ন করার দায়িত্ব শুধুমাত্র অসংগঠিত কর্মচারীদের নয়। সংগঠিত অংশেরও সমান দায়িত্ব তাদের সংগঠিত হতে সহায়তা করা। একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন থেকে অস্থায়ী কর্মচারীদের সংগঠিত করার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে অ্যাডহক কমিটি গঠিত হয়েছে। অস্থায়ী কর্মচারীদের সংগঠিত করে আন্দোলনের সংগ্রামী সহযোদ্ধা তৈরীর যে দায়িত্ব বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন অর্পণ করেছিল, তাকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হলেও তাকে প্রসারিত করার দায়িত্ব রূপায়ণ করতে হবে।

বঞ্চনা আর অবজ্ঞার অবসানে কোনো ধরনের হুমকি বা ভীতি প্রদর্শনের কাছে মাথা নত না করে দাবি আদায়ে অনড় মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে প্রতিটি কর্মচারীর কাছে পৌঁছানোর পরিকল্পনা রচিত হয় রাজ্য সম্মেলনে। কর্মচারী ও সাধারণ জনগণের সম্পর্ককে দৃঢ় ও মজবুত করে 'অধিকার-সম্প্রীতি জাঠা' জেলার অভ্যন্তরে প্রতিটি ক্ষেত্রে রূপায়ণের দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করে রাজ্য সম্মেলন। এই প্রত্যয়কে কার্যকরী করতে লড়াইয়ের মনোবলকে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। প্রতিবাদের ভাষাকে প্রতিরোধে উন্নীত করেই গণতন্ত্রকে রক্ষা, ধর্মনিরপেক্ষতার ঐক্যকে রক্ষা সর্বোপরি জীবন-জীবিকার উপর অসহনীয় আক্রমণের মোকাবিলা করা সম্ভব। এই লড়াই একা ব্যক্তিবিশেষের নয়, সমষ্টির। কর্মচারীদের সাথে নিরন্তর যোগাযোগের মাধ্যমে তাদেরকে আন্দোলন-সংগ্রামে শামিল করার মাধ্যমেই তা সম্ভব। বর্তমানে কর্মচারীদের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষার প্রশ্নে শূন্যপদজনিত সমস্যার কারণে এবং কাজের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্বের বাস্তবতা বর্তমানে নেই। তাই এই প্রতিবন্ধকতা কাটাতে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। প্রয়োজনে সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে নিজের কর্মীসত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে কর্মচারীর পাশে দাঁড়াতে হবে। বিশ্বায়নের আক্রমণ সর্বগ্রাসী। আজকে তার বিভিন্ন রূপ পরিস্ফুট হচ্ছে। এই সমস্ত প্রশ্নে প্রতিনিয়ত নিজেকে জাগ্রত রেখেই বিনম্রভাবে সকলের কাছে পৌঁছোতে হবে। ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী শোনাই শুধু কাজ নয়, প্রধান কাজ প্রাপ্ত অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে কর্মচারীকে দিশা দেখানো। কাজের পূর্ণতা পাবে তখনই, যখন সমস্ত ভয়-ভীতি, সংশয় কাটিয়ে কর্মচারীদের সহমতে আনা যাবে। আবার সহমতে আনা কর্মচারীদের আন্দোলনের রাস্তায় নামানো যাবে। এটা সম্ভব যদি আমি নিজেই প্রয়োজনীয় গুণাবলী অর্জন করে কর্মচারীর কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য তৈরী করতে পারি—যার চেষ্টায় হাজার হাজার কর্মী-নেতৃত্ব সচেষ্ট রয়েছেন। তার প্রতিফলন পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে গত ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ ঐতিহাসিক কেন্দ্রীয় কর্মসূচীতে ঘটিয়েছেন, যা লড়াই-আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। এই সাফল্যমণ্ডিত সংগ্রাম থেকে ১৩ মার্চ, '২৬ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল, যা আসন্ন নিয়োগকর্তা পরিবর্তনের সংগ্রামকে তরান্বিত করবে।

তবে স্মরণে রাখা প্রয়োজন, অধিকার অর্জনের জন্য একটি বা দুটি কর্মসূচীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে লাগাতার সংগ্রামের মধ্যে আমাদের থাকতে হবে। শ্রমিক-কর্মচারীদের শ্রেণী সংগ্রাম হল দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম। যা সবসময় সরলরেখা ধরে চলে না। যে-কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির অভ্যন্তরেই নিহিত থাকে সম্ভাবনার বীজ। স্বৈরাচারীরা ক্ষমতার ঔদ্ধত্যে স্বেচ্ছাচার ডেকে আনে যা ইতিহাসে বারে বারে প্রমাণিত। স্বৈরাচারের লক্ষ্য হলো, নিজের স্বার্থে বিরোধীদের দমন করতে ক্রমশ আরও স্বৈরাচারী হতে হয়। মুখে গণতন্ত্রের বুলি আওড়ালেও আস্তে আস্তে দাঁত, নখ নিয়ে প্রকৃত রূপ প্রকাশ করে। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য রাষ্ট্রের সমস্ত উপাঙ্গকেই নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। কিন্তু গণতন্ত্র বড়ই নির্মম। সে তার পথ খুঁজে নেয়। তাই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণ ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। আত্মসমর্পণ নয়, প্রতিরোধের জন্য মাথা আমাদের তুলতেই হবে। নিয়োগকর্তার আক্রমণের শিকার সমগ্র কর্মচারী সমাজ, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, তা জনগণের সামনে উন্মোচিত করতেই হবে। ভবিষ্যতে সুরক্ষার স্বার্থে রাজ্যে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থবাহী সরকার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এই কাজ করতে পারলে তবেই দেশে গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত রাখা সম্ভব। এই বার্তা নিয়ে পরিবার-পরিজন সহ কর্মচারী সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা পালনে রাজ্য সম্মেলন দিক নির্দেশ করেছে। রাজ্যে আসন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামে জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার সংগ্রামে যথাযথ ভূমিকা পালনে আসুন আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হই। □

"আর কোনো আপোস নয়, নয় কোনো অর্ধেক সিদ্ধান্ত"

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের অষ্টাদশ জাতীয় সম্মেলনে এ আর সিন্ধুর আহ্বান

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের অষ্টাদশতম জাতীয় সম্মেলন গত ২৩ থেকে ২৬ জানুয়ারী, '২৬ মহারাষ্ট্রের শিরডি শহরে (আর জি কারনিক নগর) অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সি আই টি ইউ-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তথা অল ইন্ডিয়া কো-অর্ডিনেশন কমিটি অফ ওয়ার্কিং উইমেন-এর সমন্বায়ক এ আর সিন্ধু। তিনি যথাযথ সম্ভাষণপূর্বক তাঁর ভাষণের শুরুতেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের সি আই টি ইউ-র পক্ষ থেকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানান।

তিনি তাঁর আলোচনায় বলেন ঃ আমাকে এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অল ইন্ডিয়া স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশন (AISGEF)-কে ধন্যবাদ জানাই। এটা আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে আমিও আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে AISGEF-এর সদস্য ছিলাম, কারণ মাত্র ১১ মাসের জন্য আমি কেরালায় কর্মরত ছিলাম।

এটা কোনো অতিরঞ্জিত বিষয় নয় বা খুব ছোটো বিষয়ও নয় যে বর্তমানে যে সম্মেলনগুলো হচ্ছে সেগুলো সমগ্র মানবজাতির জন্য। আমরা যে সিদ্ধান্তগুলো নিচ্ছি, সে সি আই টি ইউ হোক বা AISGEF হোক, তা শুধু শ্রমিক বা কর্মচারীদের উপর নয়, পুরো দেশ বা দেশের জনগণের উপর প্রভাব ফেলবে। আর দেশে যা ঘটছে তা সারা বিশ্বের উপর প্রভাব ফেলবে। এই মুহূর্তে যে আন্দোলনের রূপরেখা আমরা তৈরী করছি, তা কেবল কর্মচারীদের জন্য নয়, বরং গোটা দেশ ও জনগণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ; এই বিষয়টি আমাদের গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। সমস্ত পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তের প্রতিফলন গুরুত্ব সহকারে ঘটাতে হবে। নচেৎ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের গ্রহণ করবে না, আমাদের ক্ষমা করবে না। আমরাই সেই শ্রেণীর মানুষ যারা ইতিহাস তৈরী করে। আর এই কারণে আমাদের গর্বিত এবং একইসাথে দায়িত্বশীলও হতে হবে।

আমাকে শ্রমকোড নিয়েও বলতে বলা হয়েছে। আজকের রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে গেলে শ্রমকোডের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া যায় না। গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলতে হলে শ্রমিকের অধিকার এবং ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর উপর চাপিয়ে দেওয়া শ্রমকোড নিয়ে কথা বলতেই হবে। আমাদের বোঝা জরুরি যে শুধু আইনের ধারাগুলির কী পরিবর্তন হয়েছে তা নয়, বরং কেন এই সময়ে এগুলো আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং এর পেছনের রাজনীতিটা কী? সম্প্রতি সংসদ অধিবেশনে আমরা দেখেছি জনবিরোধী আইনগুলোর একপ্রকার বৃষ্টি নেমেছে। আমরা বলি এটি জনগণের উপর একপ্রকার গণহত্যামূলক আক্রমণ। এগুলো সবই নব্য উদারবাদী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্কটের ফল। এই ব্যবস্থা মানুষের কোনো সমাধান দিতে পারছে না। বরং নিজেরাই সঙ্কটে জীর্ণ—কাঁপছে। যে কারণে তারা মানবতা, গণতন্ত্র ও আইনকে ধ্বংস করে কর্তৃত্ববাদী পথে হাঁটছে, শেষে যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে। তারা অসহায় বলেই এমন আচরণ করছে।

পুঁজিবাদের সঙ্কট মানেই মুনাফার সঙ্কট। কর্পোরেটদের লাভ কমে যাচ্ছে। তাই তারা যুদ্ধ, আগ্রাসন ও গণহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। এই

সি আই টি ইউ নেতৃত্ব এ আর সিন্ধু

যুদ্ধ জমির জন্য নয়, মুনাফার জন্য। সঙ্কটের বোঝা তারা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। ভারত সরকারের ভূমিকা হলো এই বোঝা জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া, বিশেষত শ্রমিক ও কৃষকদের উপর। আর শ্রমকোড আনা হচ্ছে সেই উদ্দেশ্যেই উৎপাদনের খরচ কমাতে, অর্থাৎ শ্রমিকদের আরও বেশি শোষণ করতে। বলা হচ্ছে ২৫ হাজার টাকা আয় মানে শীর্ষ ১০ শতাংশের সারিতে। অথচ আমাদের দাবি অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরি ২৬ হাজার টাকা। তার মানে ৯০ শতাংশ মানুষ ন্যূনতম মজুরিও পাচ্ছে না। মজুরি কাঠামোই ভেঙে দেওয়া হয়েছে, আনা হয়েছে ফ্লোর লেভেল মিনিমাম ওয়েজ, মানে ১৭৮ টাকা, অর্থাৎ মাসে প্রায় ৫০০০ টাকা। স্থায়ী চাকরি প্রায় শেষ। আউটসোর্সিং, সাব-কন্ট্রাক্ট, ট্রেনি—এ সবকিছুই অনিশ্চিত কর্মসংস্থানকে বৈধতা দিচ্ছে। নির্দিষ্ট মেয়াদের চাকরি মানে পদোন্নতি নেই, সিনিয়রিটি নেই, সামাজিক ন্যায় নেই। কাজের ঘণ্টা বাড়ানো হচ্ছে। ১২ ঘণ্টার কাজকে ন্যায্য করা হচ্ছে। মানুষ আর মানুষ থাকবে না, দাসে পরিণত হবে। একটি বিধি বদলেই দেশের ৭০ শতাংশ কারখানা ও ৯০ শতাংশ শ্রমিককে শ্রম আইনের বাইরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এটাই এই শ্রম কোডের বাস্তবতা।

সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। বলা হচ্ছে—সবাই পেনশন পাবে। কিন্তু কী পেনশন? টাকা কোথায়? আমাদের নিজেদের পেনশনের কী হলো? পেনশনই তো আমাদের প্রধান লড়াইয়ের একটি ক্ষেত্র ছিল, আছেও। এখন পুরোনো পেনশন ব্যবস্থা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ই পি এফ, ই এস আই—সব কভারেজ তুলে দেওয়া হচ্ছে। যদি কোনো শ্রমিক ১৫ হাজার টাকা বেতন পায়, সে আর ই পি এফ-এর আওতায় পড়বে না। আর যদি কেউ ২০ হাজারের বেশি পায়, সে ই এস আই-এর আওতায় থাকবে না। সব শেষ করার পরিকল্পনা।

আর নিরাপত্তা? সেটাও সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হয়েছে। আগে যদি কারখানার মালিক নিরাপত্তা না দিতেন, তাহলে তাকে আইনের আওতায় আনার ব্যবস্থা ছিল। সেই ধারাটি তুলে দেওয়া হচ্ছে। "আইন ডিক্রিমিনালাইজড করা হচ্ছে"—কথাটির মানে কী? যে মালিক শ্রমিককে নিরাপত্তা না দিয়ে লাভের জন্য তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে, তাকে অপরাধী ধরা হবে না। আগে শ্রমিকের পি এফ-এর টাকা না জমা দিলে মালিকের বিরুদ্ধে মামলা হতো। সেটাও তুলে দেওয়া হয়েছে। ঘোষণা কী? শ্রমিকরা গ্র্যাচুইটিও পাবে। কিন্তু ৬ মাস কাজ করা শ্রমিক কি তা পাবে? কে দেবে? টাকা আসবে কোথা থেকে? কোনো ব্যবস্থা নেই, কোনো অর্থ নেই। এভাবেই সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ধ্বংস করা হয়েছে।

নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও সব সুরক্ষা তুলে দেওয়া হচ্ছে। বৈষম্যের বিরুদ্ধে যে আইন ছিল, সমান মজুরি আইন, তা শুধু মজুরিই নয়, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি---সব ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিত। এখন কেবল মজুরির বিষয়টি রাখা হয়েছে। পদোন্নতি, বদলি কিছুই নেই। নারীদের রাতের কাজের উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, সেটাও তুলে দেওয়া হয়েছে। আগে শর্ত সাপেক্ষে অনুমতি দিতে হতো---পরিবহণ, নিরাপত্তা, আলো, সিসি টিভি ইত্যাদি। এখন আর কিছুই লাগবে না। শুধু শ্রমিকের কাছ থেকে লিখিত সম্মতি নিলেই হবে। কে লিখবে না? না লিখলে যে কাল থেকে কাজ থাকবে না। শ্রম পরিদর্শনের ব্যবস্থাও শেষ। এখন আর Inspector নেই---সবাই facilitator। তারা শুধু উপদেশ দেবে, শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা নেই। এর ফলে কর্মক্ষেত্রে হয়রানি আরও বাড়বে। এমনকি সরকারী ক্ষেত্রেও দিনে নারী নিরাপদ নয়। নারীদের উপর দ্বিগুণ কাজের বোঝা চাপানো হচ্ছে—২৪ ঘণ্টা কাজ, ঘরে-বাইরে। বিশ্রাম নেই। ভূগর্ভস্থ খনি, ক্ষতিকর রাসায়নিক---সর্বত্রই নারীদের কাজের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এটা শুধু নারীদের জন্য নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও ক্ষতিকর।

সংগঠনের স্বাধীনতাও শেষ। মালিকদের অপরাধমুক্ত করা হচ্ছে। আর ইউনিয়ন গঠন করতে গেলে পুরো সদস্য তালিকা মালিক ও দপ্তরে দিতে হবে। পরদিনই চাকরি যাবে। আইনি ধর্মঘট আর সম্ভব নয়। নোটিশ দিলে আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে, তখন ধর্মঘট বেআইনি। নোটিশ ছাড়াও ধর্মঘট বেআইনি, নোটিশ দিয়েও বেআইনি। এই হচ্ছে শ্রমকোডের ফল। BNS (ভারতীয় ন্যায় সংহিতা) আইনে যে-কোনো যৌথ আন্দোলনকে রাষ্ট্রবিরোধী বলা যেতে পারে। ধর্মঘট করলে জামিনহীন গ্রেপ্তার করা যাবে। গণতন্ত্র ধ্বংসের মুখে। যৌথ আন্দোলনই গণতন্ত্রের ভিত্তি। ১৯২৬ সালের ট্রেড ইউনিয়ন আইন যদি শেষ হয়, তাহলে রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারও শেষ। এটি ফেডারেল কাঠামোর উপর আঘাত। শ্রম আইন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা—সব বিষয়ে কেন্দ্র ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। রাজ্য সরকার কিছুই করতে পারছে না। যদিও কেরালা সরকার এই শ্রমকোড কার্যকর করবে না বলে ঘোষণা করেছে এবং আইনি পথ খুঁজছে। এ আক্রমণ শুধু শ্রম আইনের নয়—রাজ্যের অধিকার, সম্পদ, স্বায়ত্তশাসনের উপর আক্রমণ। এতে শ্রমিক আন্দোলনের দর কষাকষির ক্ষমতাও ভেঙে পড়বে। আমেরিকার মতো অবস্থা এখানেও হবে—সরকারী প্রতিষ্ঠান মাসের পর মাস বন্ধ ছিল, বেতন দেওয়ার টাকা ছিল না। স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিবাদ প্রতিরোধস্বরূপ ১২ ফেব্রুয়ারী, '২৬ ধর্মঘটের গুরুত্ব অনুভব করতে হবে। Situation "Do or Die"।

● সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

এস আই আর-এর নামে মানুষের ভোটাধিকার ক্ষুণ্ণ করা চলবে না

উৎসর্গ মিত্র

রাজ্যে এখন আতঙ্কের আর এক নাম এস আই আর বা স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন অফ ভোটার লিস্ট—সাদা বাংলায় ভোটার লিস্টের নিবিড় সংশোধন। এই কাজ বা এই ধরনের কাজ নানা সময়ে নানা নামে হয়েই আসছে বছরের পর বছর। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে এটা নতুন কিছু না, কিন্তু এই বারে দেশের নির্বাচন কমিশন যে ভাবে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে কাজে নেমেছে, তা আগে কখনোই হয়নি। এর সাথে সমান তালে পাল্লা দিয়েছে বাংলার ছোট-বড় প্রায় সব মিডিয়া। দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলিও পিছিয়ে থাকছে না। একটা নিতান্তই নিয়মতান্ত্রিক কাজকে সবাই মিলে এমন ভাবে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসছে, এমন সব কথা-বার্তা চালানো হচ্ছে এই কাজ সম্পর্কে যে, মানুষের মনে এক আতঙ্ক, এক অজানা ভয় বাসা বাঁধতে থাকছে। এমনটা নয় যে শুধু এই রাজ্যেই এরকম পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে। আসলে গোটা দেশের যেখানেই এই এস আই আর-এর কাজ হচ্ছে, সেখানেই এমন পরিস্থিতি বিরাজ করছে, মানুষ বাধ্য হচ্ছেন বিনিদ্র রজনী যাপন করতে।

নির্বাচন কমিশন নিজেও এই পরিস্থিতির জন্যে দায়ী। শুধুমাত্র ঢাক-ঢোল পেটানোই না, তাদের কার্যপদ্ধতিও মানুষের মনের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করছে। যে পদ্ধতিতে এ যাবৎ দেশে ভোটার লিস্টের সংশোধন হয়েছে, নির্ভুল হওয়া সত্ত্বেও সেই পদ্ধতি বদলে ফেলে এক সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে কাজ চালাতে গিয়ে প্রথম থেকেই মানুষের মনে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে চলেছে এই নির্বাচন কমিশন। তারপর থেকে যতদিন এগিয়েছে, সে ধোঁয়াশা বেড়েছে বৈ কমেনি। পদ্ধতি প্রকরণের গালভরা নানান নাম আছে, কিন্তু তাদের কাজ কী, তা না বুঝতে পেরেছেন এই কাজে যুক্ত কর্মীরা, না বুঝতে পেরেছেন জনগণ। বিশেষ করে জনগণই হয়রানির শিকার হয়েছে এবং হচ্ছে বারে বারে।

গত ২৪ জুন, ২০২৫ বিহারকে দিয়ে এই এস আই আর-এর যাত্রা শুরু। এরপর অক্টোবরে ঘোষণা হয় ছত্তিশগড়, রাজস্থান, গোয়া, মধ্য প্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরালা, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, আন্দামান নিকোবর, পুঁদুচেরি এবং লাক্ষাদ্বীপে কাজ শুরুর। জানানো হয় বাকি ২২ রাজ্যে এই কাজ হবে আগামী এপ্রিল মাস থেকে। অর্থাৎ সারা দেশেই এই এস আই আর-এর প্রক্রিয়া চলবে ভোটার লিস্ট নির্ভুল করার লক্ষ্যে। এতে কারুর আপত্তি থাকার কথা নয়, কারণ লিস্টে ভুয়ো ভোটার থাকার অর্থ ভোটের ফলাফলে জনগণের মনোভাবের সঠিক প্রতিফলন না হওয়া। সমস্যা হচ্ছে এইবারের এস আই আর-এর পদ্ধতি নিয়ে। গোটা ব্যাপারটাই করা হচ্ছে অত্যন্ত দ্রুততা এবং তাড়াহুড়োর মধ্যে দিয়ে। হিসেব মতো এটা কমিশনের রুটিন কাজ, বছরের পর বছর তারা এই কাজই করে আসছে। সুতরাং এর পদ্ধতি প্রকরণের সবটাই তাদের নখদর্পণে থাকার কথা। কিন্তু এইবারে দেখা যাচ্ছে, কমিশন যেন একটা আপাত দিশাহারা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। বারে বারে মনে হচ্ছে শুধু মাত্র ভোটার লিস্টের সংশোধন যেন তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়—এর আড়ালে আরও কিছু যেন লুকানো আছে আর এই কারণেই রুটিন কাজে অভিজ্ঞ কমিশনের এতো অপরিকল্পিত চেহারা। শুধু ভোটার লিস্টের সংশোধন যদি তার উদ্দেশ্য থাকত, তাহলে সে কাজ কবেই শেষ হয়ে যেতে পারত এবং কাকপক্ষীতেও সেটা টের পেত না, যেমনটা এর আগের আগের বারগুলোয় হয়েছে।

এস আই আর-এর প্রাথমিক কাজগুলো করার কথা বি এল ও বা বুথ লেভেল অফিসারদের। তাঁরা প্রত্যেকের বাড়ি যাবেন এই এস আই আর-এর কাজ নিয়ে। এই অবধি নতুনত্বের কিছু নেই। প্রতিবারই ঠিক এই ভাবেই কাজটা হয় বা হতো। এবারের নতুনত্বটা হলো, বি এল ও-রা বাড়ি বাড়ি যাবেন, কিন্তু তাঁরা অন্যান্য বারের মতো ভোটারদের খোঁজ নিয়ে নাম রাখা বা বাদ দেওয়া কিংবা নতুন ভোটারদের নাম তোলার কাজটা আর করবেন না। পরিবর্তে তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ২০২৫ সালের ভোটার লিস্টে যাঁদের নাম ছিল, তাঁদের নামে নামে ছবি সহ একটা করে ফর্ম দিয়ে আসবেন। ভোটারের দায়িত্ব হলো সেই ফর্ম ভর্তি করে ফের বি এল ও-কে জমা দিয়ে দেওয়া পরবর্তী ধাপের জন্যে। ফর্ম ভর্তি করার সময়ে শেষ এস আই আর-এর সময়ে অর্থাৎ ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে ভোটারের থাকা তথ্যাবলী উল্লেখ করতে হবে। যাঁদের ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম ছিল না, অথচ ২০২৫ সালের ভোটার লিস্টে নাম তাছে, এমন নাগরিকদের ২০০২ সালে ভোটার লিস্টে নাম থাকা পিতৃপুরুষের তথ্য সহ ফর্ম জমা দিতে হবে।

অর্থাৎ প্রথম থেকেই পদ্ধতিটাকে সরল করার পরিবর্তে জটিল করে দেওয়া হলো। আগে যে কাজটা করতে দু-মিনিট লাগত এবং নিজের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করতে নাগরিকদের কোনও পরিশ্রম করতে হতো না, রাষ্ট্রই তার অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করে দিত, এবারে সেই কাজ করার জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো। ভোটারকে প্রথমে হন্যে হয়ে খুঁজে ২০০২ সালের ভোটার লিস্ট বের করতে হবে, তারপর সেখান থেকে তথ্য যোগাড় করে ফর্মে ভরতে হবে। যাঁরা ২০০২ সালের পর ভোটার হয়েছেন, তাঁদের ২০০২ সালের লিস্ট থেকে পিতৃপুরুষের তথ্য নিয়ে ফর্মে লিখতে হবে, নিজের বয়সের প্রমাণ দিতে হবে—তাও আবার কমিশন যেরকম বলেছে, ঠিক তেমন ভাবেই, তারপর সেটা জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বি এল ও-রা ফের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম জমা নেবেন, এমন কথা থাকলেও নির্বাচন কমিশন তাঁদের যে সময় বেঁধে দিয়েছে, তাতে সেটা সম্ভব হওয়ার কথাই না। সুতরাং তাঁরা নির্দিষ্ট কোনও একটা জায়গায় বসে থাকবেন এবং নাগরিকদেরই তাঁদেরকে খুঁজে নিয়ে তাঁদের নির্দিষ্ট ফর্ম জমা দিতে হবে নিজেদের অধিকার রক্ষার তাগিদে। ভাবা যায়!! আচ্ছা, যাঁরা পরিযায়ী শ্রমিক (বিশেষ করে আমাদের রাজ্য সরকারের বদান্যতায় এঁদের সংখ্যাই সব থেকে বেশি), তাঁরা কী করবেন? একবার এসে ফর্ম নেবেন, তার পর এসে জমা দেবেন, তারপর ডাক পড়লে আবার আসবেন এবং এরকম চলতেই থাকবে একেবারে শেষ পর্যন্ত? তাঁদের নিয়োগ কর্তা ছুটি না দিলে কমিশন তার ব্যবস্থা করে দেবে তো? তার গাড়ি ভাড়ার ব্যবস্থা করে দেবে তো? এর উত্তরে কেউ বলবেন কমিশন তো অনলাইনে ফর্ম জমার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। দেশের যে-কোনও জায়গা থেকেই ফর্ম তোলা এবং জমা দেওয়া যায়। ঠিক কথা। কিন্তু যাঁরা মুটে-মজুর বা ওই ধরনের অন্য কোনও পেশায় যুক্ত ভিন্ রাজ্যে, তাঁরা এইসব অনলাইনের সুবিধা কোথা থেকে যোগাড় করবেন? যাঁরা দেশের প্রান্তিক মানুষ, নুন আনতে পান্তা ফুরায় যাঁদের, ঝুপড়িতে বাস করতে বাধ্য হন, ফুলকিতে ঘর জ্বলে, বন্যায় ভেসে যায়, শিক্ষা যাঁদের স্বপ্নে আসে—সম্ভব তাঁদের পক্ষে কমিশনের বায়না মেটানো? এর উত্তর কমিশনের কাছে নেই। আমার সংবিধান প্রদত্ত অধিকার রক্ষা করতে চাইলে আমায় অর্থ এবং সময় কেন খরচ করতে হবে—এর উত্তর কমিশনের কাছে নেই। আর সন্দেহটা এখানেই। কী জন্যে এমন ব্যবস্থার সৃষ্টি? কাদের জন্যে?

বিহার দিয়ে শুরু এস আই আর, ভোটের আগে সেখানে যথেষ্ট বিতর্কিত পদ্ধতিতে কোনোরকমে শেষ হয়েছে কয়েক লক্ষ ভোটারের নাম কেটে দিয়ে। কিন্তু দ্বিতীয় দফায় পশ্চিমবঙ্গে বা অন্যান্য রাজ্যে, বিশেষ করে কেরালা এবং তামিলনাড়ুতে যা হচ্ছে, তা এক কথায় অভূতপূর্ব এবং স্পষ্টতই গায়ের জোরে নির্দিষ্ট ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার কর্মসূচী। এখানে বলা হচ্ছে (এবং অন্যান্য জায়গাতেও) যাদের নামে সন্দেহ আছে, তাদের জন্মের শংসাপত্র অথবা মাধ্যমিক সমতুল শংসাপত্র জমা দিতে হবে। রেশন কার্ড চলবে না, প্যান কার্ড চলবে না, কমিশনের নিজের দেওয়া ভোটার কার্ডও চলবে না, জমা দিতে হবে জন্মের অথবা শিক্ষার শংসাপত্রই। ভারতবর্ষের মতো স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা একটা দেশে বিশেষ করে গরিব গ্রামের প্রান্তিক মানুষের সন্তান জন্ম নেয় পুরাতন পদ্ধতিতে দাইয়ের হাতে নিজের বাড়িতে। সেখানে তাদের জন্মের শংসাপত্র কে দেবে? আর শিক্ষার শংসাপত্র? দেশের ৮০ ভাগ মানুষের যেখানে দৈনিক আয় ২০ টাকার কম, যেখানে আজ খেতে পেলে কাল কী খাবে তার ঠিক থাকে না, সেখানে বাচ্চার বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ কোথায়? তাহলে তারা নিজেদের ভোটাধিকার রক্ষা করবে কী ভাবে? তারা কি দেশের নাগরিক নয়?

এই প্রশ্নটাই মানুষকে তাড়া করছে এখন সবচেয়ে বেশি আর আতঙ্কও ওই জন্যেই। গত বছরের অক্টোবরের মাঝামাঝি ঘোষণা হয়েছিল এখানে এস আই আর শুরুর। শুরু থেকেই নির্বাচন কমিশন এবং বঙ্গ মিডিয়া এমন একটা প্রচার শুরু করেছিল, যেন ভোটার লিস্টে নাম না থাকলে দেশেই থাকার অধিকার হারাবে মানুষ। শুধু মানুষের মনে না, নির্বাচন কর্মী হিসেবেও যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছিল বি এল ও হিসেবে, আতঙ্ক ছড়ানো হয়েছিল তাঁদের মনের ভিতরেও ঠিক মতো কাজ করতে না পারলে, সময় মতো কাজ শেষ করতে না পারলে তাঁদের চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে বলে। এই ধরনের নানা আতঙ্ক সহ্য করতে না পেরে শুধু মাত্র ২৮ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বরের মধ্যেই ১১টা প্রাণ ঝরে গিয়েছে এখানে। এদের মধ্যে ৬টি আত্মহত্যা। ২৮ অক্টোবর যিনি আত্মহত্যা করেছিলেন, পানিহাটির শ্রী প্রদীপ কুমার কর, তিনি স্পষ্ট করে তাঁর সুইসাইড নোটে লিখে গিয়েছিলেন, যে ভোটার লিস্টে নাম থাকার জন্যে যে নথি দরকার, অর্থাৎ জন্মের বা মাধ্যমিকের শংসাপত্র তাঁর কাছে নেই আর তাই ভোটার লিস্টেও তাঁর নাম থাকবে না আর তাই সম্ভাব্য এন আর সি-তে (ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেন্স—দেশকে মুসলিম শূন্য করতে বিজেপির স্বপ্নের কর্মসূচী) তাঁর নাম বাদ চলে যাবে, ফলে তিনি বাধ্য হবেন ডিটেনশন ক্যাম্পে চলে যেতে। আতঙ্ক সহ্য করতে না পেরে তিনি নিজের জীবন শেষ করে দিচ্ছেন।

চল্লিশ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে বীরভূমের ইলামবাজারে চলে আসা ৯৫ বছরের বৃদ্ধও একই কারণে তাঁর জীবন শেষ করে দিয়েছেন গত ৩১ অক্টোবর। মৃতের তালিকায় আছে একাধিক বি এল ও-র নামও। কাজের চাপ এবং নির্বাচন কমিশনের তাড়না সহ্য করতে না পারার ফলেই তাঁদের জীবনহানি ঘটেছে বলেই খবর। এগুলোর কোনোটাই দুর্ঘটনার মৃত্যু নয়। এগুলোর সবটাই এক নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে অমানবিক কর্মকাণ্ডের ফসল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এন আর সি-র জন্যে যে সমস্ত নথি চাওয়ার কথা হয়েছে, ঠিক সেই সমস্ত নথিই এখন চাওয়া হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে। সুতরাং যাঁরা আতঙ্কে ভুগছেন, তাঁদের আতঙ্ক যে অমূলক—এ কথা বলা যাবে না কিছুতেই।

কিন্তু এত সব কী জন্যে? একটা কারণ হতে পারে এন আর সি-র মহড়া। কিন্তু অপর কারণটা অবশ্যই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট সংখ্যার ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া। একেবারে রাজনৈতিক কর্মসূচী। খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, ১২ রাজ্যে যে সমস্ত ভোটারের নাম শেষ পর্যন্ত বাদ গিয়েছে (এখনও পর্যন্ত সারা দেশে প্রায় ৮ কোটি), সেগুলির সবই প্রায় হয়েছে জায়গা এবং গোষ্ঠী ধরে ধরে, যাতে আগামী নির্বাচনগুলিতে বিজেপি বা তার সহযোগী দলগুলি সুবিধা পায়। সবচেয়ে বেশি নাম বাদ গিয়েছে প্রান্তিক মানুষের, কারণ বিশেষ করে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে এঁদের মধ্যে অবিচার পাওয়ার ক্ষোভ ক্রমবর্ধমান। আবার কেরালাতেও এঁদের নাম বাদ গিয়েছে কারণ, দৃষ্টিভঙ্গীগত কারণেই এনারা কেরালার বর্তমান সরকারের কাছ থেকে সুবিধা পান সব চাইতে বেশি। ফলে ঢেলে ভোট দেন তাঁরা বর্তমান সরকারের পক্ষেই। সুতরাং এঁদের নাম বেশি করে ভোটার লিস্টে থাকলে বিজেপির অসুবিধা।

আমাদের রাজ্যেও ঘটনাক্রম একই। এখানকার মুসলিম জনগোষ্ঠী ক্রমশ রাজ্যের সরকারের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে মতুয়ারাও। উত্তরবঙ্গের আদিবাসী জনগোষ্ঠী ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠছে এখানকার শাসক দলের উপর। ফলে যে ৬০.৬ লক্ষ ভোটারের নাম শেষ পর্যন্ত বাদ পড়ে গেছে (রাজ্যের জনসংখ্যার ৮ শতাংশ), তাদের সিংহ ভাগ দখল করে রয়েছেন এঁরাই। এতে স্পষ্টত সুবিধে হবে তৃণমূলেরই আর কে না জানে যে মুখে যাই বলুক না কেন, যতই মুষ্টিযুদ্ধের অভিনয় করুক না কেন, তৃণমূল কংগ্রেস আসলে বিজেপিরই বন্ধু শক্তি। বারেবারেই এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। ফের সেটা প্রমাণিত হয় যখন দেখা যায়, এ রাজ্যের বামপন্থী কোনও সংগঠন মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে কালো পতাকা দেখাতে গেলে রাজ্য পুলিশ নির্মম ভাবে সেটা দমন করতে চাইছে। অবশ্যই শাসক দলের নির্দেশেই এমনটা ঘটেছে। কারণ শেষ পর্যন্ত যদি ওই ৬০.৬ লক্ষ মানুষের নাম বাদ যায় ভোটার লিস্ট থেকে, তাহলে জ্ঞানেশ কুমারের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে এ রাজ্যের শাসক দল।

গোটা দেশেই বামপন্থীরা বর্তমান এস আই আর-এর পদ্ধতি প্রকরণের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে আসছে প্রথম থেকেই। তাদের স্পষ্ট বক্তব্য, যারা ভুয়ো ভোটার, মৃত ভোটার, তাদের নাম অবশ্যই তালিকা থেকে বাদ যাক, পরিশুদ্ধ হোক গোটা দেশের ভোটার তালিকা, কিন্তু শুধু মাত্র নথি নেই বলে একজনও প্রকৃত ভোটারের নাম যেন তালিকা থেকে বাদ না যায় কারণ নাগরিকদের ভোটাধিকার দেশের সংবিধান প্রদত্ত—কোনও আমলার দয়ার দান নয়।

রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে ষাট লাখ মানুষের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রকৃত লড়াইয়ে নেমেছে এ রাজ্যেও বামপন্থীরাই। সাথে অবশ্যই রয়েছেন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণ। তাঁরা ধরনায় বসছেন রাতের পর রাত, মিছিল করছেন, সমাবেশ করছেন, মানুষকে তাঁর বিপদ সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করছেন। সরকারী পয়সায় আন্দোলনের নাটক নয়, জান-প্রাণ দিয়ে লড়ে যাচ্ছেন তাঁরা। অবশ্যই তাঁদের সে লড়াই সফল হবে। মানুষের ভোটাধিকার রক্ষিত হবে। তাঁরা ভোট দেবেন। অন্ধকারের শক্তি পরাস্ত হবে খুব দ্রুত। □

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পরে

আর কোনো আপোস নয়, নয় কোনো অর্ধেক সিদ্ধান্ত

একসময় আমরা ভাবিনি পেনশন কাটা হবে। আজ সবই আউটসোর্সিং। আর দশ বছর পর কী থাকবে কেউ জানে না। ২০২০ সালে কৃষক আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্য তৈরী হয়েছিল। সেই ঐক্যই আজ শক্তি। NPS থেকে UPS এসেছে আন্দোলনের চাপে। আরও জোরালো আন্দোলন হলে OPS-ও আসতে পারত বা পারে। শ্রমকোড প্রত্যাহার করানো এবং OPS ফিরিয়ে আনা আমাদের দায়িত্ব। ঐক্য ও সংগ্রামই একমাত্র পথ। আর কোনো দ্বিধার সুযোগ নেই। আর কোনো আপোস নয়, কোনো অর্ধেক সিদ্ধান্ত নয়। আমাদের সার্ভিস কন্ডিশনের উপর আঘাত এলে ধর্মঘট কোনো ক্ষতি নয়, এটা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ। মানুষের কাছে আমাদের যেতে হবে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে। কোনো দ্বিধা, কোনো টালবাহানা নয়। আমরা যদি একসাথে পূর্ণ বিশ্বাস ও ঐক্য নিয়ে দাঁড়াই তাহলে কোনো শ্রমিক-কর্মচারী বিরোধী নীতি টিকতে পারবে না। একথা পরিষ্কারভাবে বলা যায় যে এই ধ্বংসাত্মক নীতিগুলো ওদের শক্তি থেকে আসেনি, এসেছে আমাদের দুর্বলতা থেকে।

আজ আমরা যা কিছু পেয়েছি---D.A., Promotion, Job security—তা আকাশ থেকে পড়েনি। আগের প্রজন্মের নেতৃত্বরা, কমরেডরা ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন বলেই এগুলো পেয়েছি। এখন আমাদের পালা। আমাদের উত্তরাধিকার মনে রাখুন। আপনাদের আন্দোলনের ফলেই বহু চুক্তিভিত্তিক কর্মী স্থায়ী হয়েছেন। আপনারা শুধু নিজেদের জন্য নয়, অন্যদের জন্যও লড়েছেন, লড়ছেন। প্রতিটি কর্মসূচীতে দৃঢ়তা থাকতে হবে। আধা মনোভাব চলবে না। ৫০ হোক বা ৫০০০ জন, প্রতিটি কর্মসূচী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। কোনো দুর্বলতা দেখানো যাবে না—না কাজে, না বার্তায়। একটি সংগ্রামী সংগঠন শুধু সংখ্যায় বড় হয় না, বড় হয় প্রতিশ্রুতিতে। আপনারা অন্যতম বৃহৎ সংগঠন। সেই শক্তি সদস্যপদ আর অংশগ্রহণে প্রতিফলিত হতে হবে। মহিলা কর্মচারীদের সংগ্রামের সামনের সারিতে আনতে হবে। এতে আন্দোলনের শক্তি দ্বিগুণ হয়। পরিবার আর সমাজের মধ্যেও আত্মবিশ্বাস তৈরী হয়। সংগ্রামই ঐক্য গড়ে তোলে। সংগ্রামই জাত, ধর্ম, অঞ্চলের নামে বিভাজন ভাঙে। সংগ্রামে ঢাক বাজিয়ে সবাইকে একসাথে আনতে হবে, সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকেই নেতৃত্ব দিতে হবে। একাজে আপনারা সফল হবেন---এই বিশ্বাস ও প্রত্যাশা নিয়ে আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। □

সৌমেন চক্রবর্তী

Editor : SUMAN KANTI NAG
SANGRAMI HATIAR
State Co-ordination Committee
53rd Year, 10th Edition, February, 2026
Regd. No. : 18484/71

অধিকার সম্প্রীতি জাঠা

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সমস্ত কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা/মহার্ঘ রিলিফ অবিলম্বে প্রদান, চুক্তিপ্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ ও সমকাজে সমবেতন, সমস্ত শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ, শ্রমকোড অবিলম্বে বাতিলের দাবিতে রাজ্য জুড়ে ব্লকস্তর পর্যন্ত অধিকার সম্প্রীতি জাঠা অনুষ্ঠিত হয়। সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী বকেয়া মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান সহ রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখা এবং জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যা নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে আগামী ১৩ মার্চ রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত সমস্ত অংশের কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-শ্রমিকদের আহূত প্রত্যাঘাতের ধর্মঘট সফল করার দাবিও এই জাঠায় ধ্বনিত হয়। বিভিন্ন জেলায় সংগঠিত অধিকার সম্প্রীতি জাঠার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিম্নে দেওয়া হলো।

দার্জিলিং জেলা ঃ

জেলার শিলিগুড়ি মহকুমায় ৪ মার্চ তারিখে অধিকার সম্প্রীতি জাঠা শহরের কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে ফুড প্লাজার সামনে থেকে শুরু করে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের খড়িবাড়ি, পানিট্যাঙ্কি, নকশালবাড়ি ব্লকের পানিঘাটা মোড়, বাগডোগরা বিহার মোড়, মালিকানা ব্লকের শিবমন্দির, মেডিক্যাল কলেজ মোড়ে সমাপ্ত হয়। প্রতিটি স্থানে পথসভা ও মিছিল সংঘটিত হয় জেলাগত শতাধিক কর্মচারী ও সন্নিহিত এলাকার কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী, যৌথ মঞ্চ, ১২ই জুলাই কমিটি ও বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী নেতৃত্বের উপস্থিতিতে।

পূর্ব বর্ধমান জেলা ঃ

৫ মার্চ কালনা ও কাটোয়া মহকুমার অভ্যন্তরের ব্লকগুলিতে এবং বর্ধমান শহরের অফিসগুলিতে ৪ দফা দাবিতে ট্যাবলো সহযোগে কর্মচারী বন্ধুদের আবৃত করে প্রচার ও পথসভার পরবর্তীতে ৬ মার্চ জেলা সদরের ১৩টি ব্লকে ট্যাবলো সহযোগে প্রচার ও পথসভা সংগঠিত করা হয়। কাটোয়া মহকুমার পথসভায় বক্তব্য রাখেন নীলকণ্ঠ দাস এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিদ্যুত দাস। কালনা মহকুমার পথসভায় বক্তব্য রাখেন জয় নিয়োগী। জেলা সদরের পথসভায় বক্তব্য রাখেন দেবকুমার দত্ত। মহকুমা ও জেলা সদরের মিছিল ও পথসভায় পেনশনার্স সমিতি সহ তিন শতাধিক নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

ঝাড়গ্রাম জেলা ঃ

অধিকার সম্প্রীতি জাঠার প্রথম দিন ৭ মার্চ একটি জাঠা ঝাড়গ্রাম জেলার উড়িষ্যা সংলগ্ন নয়াগ্রাম ব্লক থেকে গোপীবল্লভপুর ব্লক এবং দ্বিতীয় জাঠা ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন বেলপাহাড়ী ব্লক থেকে বাঁকুড়া জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চল দিয়ে গিয়ে শিলদাতে সমাপ্ত হয়। ৮ তারিখ জাঠা কর্মসূচী জেলা কালেক্টরেট দপ্তর, অফিসপাড়া হয়ে ঝাড়গ্রাম শহরে সুদীর্ঘ মিছিল সংগঠিত হয়, পরবর্তীতে পথসভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক গৌতম ব্যানার্জী, যৌথ মঞ্চের পক্ষে গুরুপদ নন্দী, ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষে ফাল্গুনী চক্রবর্তী ও সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষে কালিপদ দাস। এছাড়াও ব্লকগুলিতে পথসভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অনুকূল ঘোষ ও সমরেশ ঘোষ।

দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ

বিগত ৬-৭ মার্চ, ২০২৬ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় প্রতিপালিত হয় 'অধিকার সম্প্রীতি জাঠা'। ৬ মার্চ জেলা শাসকের অফিসের সামনে বৃহৎ জমায়েত এবং অটো ও বাইক মিছিলের মধ্য দিয়ে জাঠার সূচনা হয়। বালুরঘাট মহকুমার বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করে রঘুনাথপুর, পাগলীগঞ্জ ও পতিরাম এলাকায় পথসভা হয়। পরের দিন ৭ মার্চ সকাল থেকে বাস ও সুসজ্জিত ট্যাবলো সহ জাঠা কুমারগঞ্জ বিডিও অফিস থেকে শুরু হয়ে গঙ্গারামপুর বি ডি ও অফিস, হরিরামপুর চৌমাথা হয়ে বুনিয়াদপুর কোর্টের সামনে পথসভার মধ্য দিয়ে সমাপ্তি হয়। দু'দিনের এই পথসভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন জেলা নেতৃত্ব অরূপ চক্রবর্তী, সুকান্ত ঘোষ, গণেশ ঠাকুর, কৃষ্ণা ঘোষ, কুশল ঘোষ, অচিন্ত্য মণ্ডল, মৃণাল চৌধুরী ও পলাশ দেব। জাঠা থেকে ১৩ মার্চ ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়।

হাওড়া জেলা ঃ

৫-৭ মার্চ জেলা সদর ও উলুবেড়িয়া মহকুমার অভ্যন্তরের ব্লকগুলিতে কর্মচারী বন্ধুদেরকে আবৃত করে জাঠা ও প্রচার কর্মসূচী সংগঠিত হয়। ৫ মার্চ জগৎবল্লভপুর ব্লক, ৬ মার্চ আমতা, ডোমজুড়, পাঁচলা, শ্যামপুর ব্লক এবং ৭ মার্চ উলুবেড়িয়া ও সাঁকরাইল ব্লকে জাঠা সংঘটিত হয়। সন্নিহিত এলাকার কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। সভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, সভাপতি, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সহ ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহবায়কগণ। জাঠা কর্মসূচীতে হাসপাতাল, বিডিও অফিস, বি এল এল আর ও অফিস সহ হাওড়া কোর্ট ও এস ডি ও অফিসে ১৩ মার্চ-এর ধর্মঘটের প্রচার ও পোস্টারিং করা হয়।

আলিপুরদুয়ার জেলা ঃ

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আলিপুরদুয়ার জেলা সদর ও আসাম ভূটান সীমান্তের কুমারগ্রাম ব্লক ও ভূটান সীমান্তের মাদারীহাট ব্লকের কর্মচারী ও পার্শ্ববর্তী ব্লকের কর্মচারীদের যুক্ত করে ৭ মার্চ অধিকার সম্প্রীতি জাঠা সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। জাঠা চলাকালীন বিপুল কর্মচারী জমায়েত করে ৪টি জনবহুল স্থানে পথসভা হয় যেখানে কেন্দ্রীয় ৪ দফা দাবির সাথে জেলার বন্ধ চা বাগান খোলা, ন্যূনতম মজুরি প্রদান ও জেলার মেডিকেল কলেজ স্থাপনের দাবি যুক্ত করা হয়।

উত্তর দিনাজপুর জেলা ঃ

রাজ্য জুড়ে চলা অধিকার সম্প্রীতি জাঠার প্রথম দিন উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার ব্লক, কালিয়াগঞ্জ ব্লক, হেমতাবাদ ব্লক হয়ে কর্নজোড়া জেলা কালেক্টর দপ্তর এবং কর্নজোড়া অফিস পাড়া হয়ে রায়গঞ্জে পৌঁছায়। পরবর্তীতে রায়গঞ্জ সুপার মার্কেট থেকে এন বি এস টি সি বাস টার্মিনালে মিছিল শেষে পথসভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক ফাল্গুনী সমাজদার। এছাড়াও ব্লকগুলিতে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক সহ আশিস কর, সৌমিক সাহা, সৌম্য কর। দ্বিতীয় দিন জাঠা করণদিঘি ব্লক, গোয়ালপুকুর ১ ও ২ নং ব্লক হয়ে ইসলামপুর বাস টার্মিনার্সে শেষ হয়। পরবর্তীতে পথসভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক, পঞ্চায়েত যৌথ কমিটির নেতৃত্ব মহকুমা সম্পাদক মনোজ সিং, জেলা নেতৃত্ব আশিস কর, উজ্জ্বল চাকী, দীপক পাল, সৌমিক সাহা, মাণিক বসাক ও সুজিত কুমার দেব। □

দেবাশীষ রায়

পাবলিক সার্ভিস কর্মীদের সম্মিলিত দর কষাকষি, চাকরি, পরিষেবা এবং মর্যাদা রক্ষা করা

অল ইন্ডিয়া স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশন (AISGEF)-এর ১৮তম জাতীয় সম্মেলনে ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল অফ পাবলিক সার্ভিস অ্যান্ড অ্যালাইড ওয়ার্কার্স (TUI-PS&A)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড জোলা সাপেথা-র বক্তব্য ঃ

মাননীয় সভাপতি সুভাষ লাম্বা জি এবং সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার জি, এই গৌরবময় ও ঐতিহাসিক সম্মেলনে আমাদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অল ইন্ডিয়া স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশনকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

কমরেড, দেশবাসী, ভাই ও বোনেরা,

অল ইন্ডিয়া স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশন (AISGEF)-এর ১৮তম জাতীয় সম্মেলন (ভারতের পাবলিক সার্ভিস কর্মীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংসদ) উপলক্ষে, আমি ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টারন্যাশনাল অফ পাবলিক সার্ভিস অ্যান্ড অ্যালাইড ওয়ার্কার্স (TUI-PS&A)-এর সাথে যুক্ত লক্ষ লক্ষ সদস্যের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে বিপ্লবী এবং আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। TUI-PS&A হলো ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস (WFTU)-এর একটি কৌশলগত অংশ।

এই বৃহৎ পাবলিক সার্ভিস কর্মচারী ফেডারেশনের প্ল্যাটফর্মের অংশ হতে পারা এবং যৌথ দর কষাকষির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের মতামত উপস্থাপন করা আমাদের জন্য সম্মান এবং সৌভাগ্যের।

ভাই ও বোনেরা, সাম্প্রতিক দশকগুলিতে, নব্য উদারনীতিবাদের অধীনে পুঁজি এবং শ্রমের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যে গভীর পরিবর্তন এসেছে। এর ফলে সরাসরি শ্রমিকদের উপর আক্রমণ হয়েছে। সরকার এবং কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা শ্রমিক এবং শ্রমিক শ্রেণীর উপর এই আক্রমণগুলি নব্য উদারনীতিবাদী নীতিগুলির দ্বারা সম্ভব হয়েছে যা শ্রমিক এবং সাধারণ জনগণের ব্যয়ে বৃহৎ পুঁজিপতি এবং ব্যবসায়িক স্বার্থের পক্ষে। শ্রমিকরা তাদের ঘাম, পরিশ্রম এবং ত্যাগের মাধ্যমে যে যৌথ দর কষাকষি অর্জন করেছিল, তা আজ বিশ্বব্যাপী আক্রমণের মুখে। উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত, সরকার এবং কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলি কঠোর থেকে কঠোরতর নীতি, ইউনিয়ন-বিরোধী আইন এবং অন্যান্য নব্য উদারনীতিবাদী নীতি বাস্তবায়ন করছে যা শ্রমিকদের অধিকার এবং জীবনযাত্রার মানকে ক্ষুণ্ণ করছে। সর্বত্র লক্ষ্য একই ঃ পুঁজিবাদের মুনাফা সংকটের বোঝা শ্রমিকদের উপর চাপিয়ে দেওয়া, তাদের মজুরি, পেনশন, সামাজিক নিরাপত্তা, সুযোগ-সুবিধা এবং কর্মপরিবেশ দুর্বল করা। এই শ্রমিক-বিরোধী নীতি বাস্তবায়নের জন্য, নয়া উদারনীতিবাদী সরকার এবং পুঁজিপতি শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণী এবং তার সংগঠনগুলিকে ক্রমাগত আক্রমণ করছে, শ্রমিকদের প্রতিরোধকে দুর্বল করার লক্ষ্যে।

কমরেডগণ, আমাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যেও গণতন্ত্র, নারী নেতৃত্ব এবং যুবদের অংশগ্রহণকে শক্তিশালী করতে হবে। পুঁজিবাদের অধীনে, শ্রমিকদের অর্জন সর্বদা হুমকির মুখে থাকে, তাই ঐক্য এবং সতর্কতা অপরিহার্য। পরিশেষে, আমি কার্ল মার্ক্সের কথা উদ্ধৃত করতে চাই ঃ

"প্রশ্নটি সর্বহারা শ্রেণী কী ভাবে তা নয়, বরং ঐতিহাসিক পরিস্থিতি কী করতে বাধ্য করে তা।"

আমাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়া উচিত নয়। □

সুমন কান্তি নাগ

বিশেষ পর্যবেক্ষণমূলক বক্তব্য

২১তম রাজ্য সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন বিশেষ পর্যবেক্ষণমূলক বক্তব্য পেশ করেন সংগঠনের অন্যতম প্রবীণ নেতৃত্ব প্রবীর মুখার্জী। সম্মেলন মঞ্চে দু'দিন ধরে যে আলোচনা চলেছে তার ওপর ভিত্তি করেই তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণমূলক বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান যে ঘূর্ণায়মান এবং জটিল পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আছি, সেই জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে গেলে আমাদের কীভাবে চলা উচিত, সেই চলার পথে আমাদের অভিজ্ঞতা প্রতিনিধিদের বক্তব্যে উঠে এসেছে। শ্রমে, ঘামে, সংগ্রামে, উত্তাল তরঙ্গের শীর্ষে যে সংগঠনের পথ চলা শুরু ১৯৫৬ সালে, আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে যে বাধার তাঁরা সম্মুখীন, সেই বাধাকে অতিক্রম করার জন্য, সেই বাধার প্রাচীর অতিক্রম করার জন্য আমাদের কী করা উচিত, সেই অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন উপস্থিত প্রতিনিধিরা। শত্রু চিহ্নিত করতে গিয়ে কেন্দ্রের শাসকদল, রাজ্যের শাসকদলের মধ্যে কে প্রধান শত্রু, তাদের মধ্যে পার্থক্য, আক্রমণের ফারাক—এসব নির্ধারণ করতে গিয়ে অনেক সময় তালগোল পাকিয়ে যায়। এই কাজ যথেষ্টই কঠিন, কিন্তু এই কঠিন কাজটিই আমাদের করতে হচ্ছে। কিন্তু এই কাজটি করতে গিয়ে সংগঠনের অভ্যন্তরে আমাদের নিজেদের ভূমিকার আত্মসমালোচনা, সমালোচনা, পর্যালোচনা আমাদের আরও গুরুত্ব দিয়ে, আরও খোলামেলাভাবে করা উচিত। নিয়মিত সাংগঠনিক অডিটের গুরুত্বের কথা তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে। তিনি আক্ষেপের সঙ্গে বলেন যে প্রতিনিধিদের বক্তব্যে মহিলা কর্মচারী, নার্সিং কর্মচারীদের ওপর আক্রমণের কথা সেভাবে উঠে আসেনি। আন্দোলন, সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্যোশাল মিডিয়ার উপর অধিক নির্ভরতার প্রসঙ্গও তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে। কর্মসূচী রূপায়ণের ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে উদ্যোগের পরিবর্তে আমরা স্যোশাল মিডিয়ার উপর আজকাল নির্ভর করছি। কেন কর্মসূচীগুলোকে আমরা আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে পারছি না, সেই সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গও তাঁর পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে। কর্মসূচীগুলোতে অবসরপ্রাপ্তদের তুলনায় কর্মরতদের উপস্থিতির ক্ষেত্রে দুর্বলতার কথাও তিনি তুলে ধরেছেন। কীভাবে নেতিবাচক দিকগুলি, দুর্বলতার দিকগুলি চিহ্নিত করে তাকে কাটিয়ে ওঠা যায় সেই বিষয়ে

পর্যবেক্ষণমূলক বক্তব্য রাখছেন প্রবীর মুখার্জী

আরও আলোচনা হওয়া উচিত ছিল বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, আমরা যারা ট্রেড ইউনিয়ন করি, নতুন ভাবনা নিয়ে ভাবি, সেখানে আমাদের শুধু তত্ত্ব না, সেখানে আমাদের প্রয়োগের দর্শনে বিশ্বাসী হতে হবে, তত্ত্বকে প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের গণভিত্তি অর্থাৎ সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি বেশ আক্ষেপের সাথে বলেন যে প্রতিনিধিদের বক্তব্যে সংগঠনের মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ারের কথা সেভাবে উঠে আসেনি, যেটা খুবই হতাশাজনক। তিনি বলেন, আন্দোলন যদি প্রবাহমান না হয় তবে তা বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হবে। আমাদের চেতনাকে যদি আমরা ট্রেড ইউনিয়ন চেতনার থেকে সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উন্নীত না করতে পারি, রাজনৈতিক চেতনায় উন্নীত না করতে পারি, তাহলে আমাদের যাবতীয় আন্দোলন, সংগ্রাম বদ্ধ জলায় পরিণত হবে। তাই আমাদের অবিরাম মতাদর্শ চর্চায় থাকতে হবে। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই পরিস্থিতিতে এমন সব ঘটনা ক্রমাগত ঘটে চলেছে বা ঘটবে যার কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা আমাদের নেই, এমনকি পূর্বে আমরা অনুমানও করতে পারিনি। সাম্রাজ্যবাদের বিপদ, পুঁজিবাদের বিপদ, পরিচিতিসত্তার বিপদ, নয়া ফ্যাসিবাদী বিপদ—আক্রমণ বহুমাত্রিক। দেশে বহুত্ববাদ, সংবিধান, গণতান্ত্রিক কাঠামো, ফেডারেল স্ট্রাকচার, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে ধ্বংস করতে চাইছে হিন্দুত্ববাদীরা। রাজ্যেও একই প্রবণতা চলছে। প্রচলিত ধারায় আমরা যে আন্দোলন করে থাকি, নব্য ফ্যাসিবাদী আক্রমণ প্রতিরোধে তা যথেষ্ট নয়। এই রাজ্য সম্মেলন থেকে শপথ নিয়ে এই নব্য ফ্যাসিবাদী আক্রমণ প্রতিরোধে আমাদের মহাসংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। এই মহাসংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য আমাদের আন্দোলনমুখী সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। □

দীপঙ্কর বাগচী

সম্পাদক ঃ সুমন কান্তি নাগ
সহযোগী সম্পাদক ঃ বিদ্যুত দাস
যোগাযোগ ঃ
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।